খুদে প্রতিভা • আমার কুইজ • আমার ইচ্ছেমতো • নতুন খেলা
আনন্দমেলা
অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ জয়
ভারত কেন হারল?
চোখ পড়ল কাদের উপর?
বিশ্বকাপের রেকর্ড
বিরাট কোহলির পোস্টার
বিশ্বকাপের অ্যালবাম
হাফ ডজন গল্প

ট্রফি জয়ের পর অস্ট্রেলিয়া দল

অজ়িদের বিশ্বজয়

বিশ্বকাপের শুরুটা ভাল না হলেও, শেষ পর্যন্ত বিশ্বজয়ীর তকমা থাকল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়ার কাছেই। তবে সেখানে ফিরে এল ১৯৮৩-র বিশ্বকাপের স্মৃতি। লিখেছেন সায়ক বসু

নাহ, ২০১১ সালের ২ এপ্রিল রাতের পুনরাবৃত্তি হল না এই ১৯ নভেম্বর রাতে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার হাতে বিশ্বকাপ দেখার স্বপ্ন বুকেই রয়ে গেল দেশের ১৪০ কোটি জনতার। মাঝে মাঝে মনে হয়, ক্রিকেট অত্যন্ত স্কিলনির্ভর এবং টেকনিক্যাল খেলা ঠিকই, কিন্তু যেটা এত কিছুর মধ্যেও নেপথ্যে জোরালো হয়ে থেকে যায় তা হল ভাগ্য। না হলে গোটা টুর্নামেন্টে এত ভাল খেলেও ভারত শেষমেশ কোনও আইসিসি ট্রফি জিততে পারে না কেন? আর কেনই বা অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্যের সঙ্গে এক অনন্ত অন্তরঙ্গতার সূত্রে ধরা পড়ে যে-কোনও বিশ্ব প্রতিযোগিতার সম্মান?

ট্র্যাভিস হেড

কখনও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি তো কখনও বা বিশ্বকাপ! ভারত হেরে গিয়েছে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, এই বিশ্বকাপে সেরা ক্রিকেট খেলেছে তারাই। সেমি-ফাইনাল পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতা এবং বিপক্ষকে দুরমুশ করে দেওয়ার নিদর্শন তারা রেখেছে, তাতে চ্যাম্পিয়ন না হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। কিন্তু ওই যে... এই বারের বিশ্বকাপের স্লোগান হিসেবে আইসিসি একটা চমৎকার লাইন বেছেছিল। ‘ইট টেক্‌স ওয়ান ডে’, মানে ‘একটা মাত্র দিনেই ঠিক হয়ে যায় কে জিতবে, কে হারবে।’ ভারতের সেই হারটা বা খারাপ পারফরম্যান্স এল সেই একটা দিনেই। এবং দুর্ভাগ্যবশত সেটা ফাইনালে! প্রায় হোঁচট খেয়ে গোটা টুর্নামেন্ট খেলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত গরিমা নিয়ে গেলেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

তবে ভাগ্যের কথা যতই বলি, অস্ট্রেলিয়া দলের আদত শক্তি বোধ হয় এটাই। ঠিক সময়ে নিজেদের সেরাটা দেওয়া। আটটা বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলে ছ'টিতেই জেতার কৃতিত্ব তো কোনও সাধারণ দলের হয় না। জনপ্রিয় ক্রিকেট ধারাভাষ্যকার হর্ষ ভোগলে ফাইনালের দিন খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলেছেন, "অস্ট্রেলিয়া দলকে আপাত ভাবে যা-ই মনে হোক না কেন, কোনও আইসিসি প্রতিযোগিতাতেই তারা শুধু অংশগ্রহণকারী দল হিসেবে আসে না।" এ বারও সেটাই হল।

ম্যাক্সওয়েল ও ওয়ার্নার

প্রতিযোগিতা শুরুর দিকে ভারত এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে পর পর দুটো ম্যাচ হেরে যাওয়ায় মনে হয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার কাপ-ভাগ্য এ বার সুপ্রসন্ন নয়। কিন্তু প্যাট কামিন্স যেন নিজের তুরুপের তাসগুলোকে লুকিয়ে রেখেছিলেন আদত সময়ের জন্য। যে ট্র্যাভিস হেড প্রথম দিকের বিশ্বকাপের সময়ে হাতে চোট নিয়ে দলের বাইরে বসেছিলেন, জল বইছিলেন নিয়মিত, তিনিই হয়ে উঠলেন অজি ত্রাতা। মার্নাস লাবুশেন তো অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ দলের প্রাথমিক পনেরোতেও ছিলেন না। কিন্তু যখন সুযোগ পেলেন, তখন ঠিক করে নিলেন, নিজের সর্বস্ব দিয়ে ঝাঁপাবেন। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের কোচ এবং সহকারী কোচেরা খেলোয়াড়দের একটা প্রশিক্ষণ হামেশাই দেন। সেটা হল ম্যাচ পরিস্থিতি তৈরি। একটি কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করে, বল এবং ব্যাটের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা তৈরি করে খেলোয়াড়দের খেলানো হয়। তাতেই বোঝা যায়, কোন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার মানসিক ভাবে কতটা কঠিন। কতটা চাপ নিতে পারেন। সেই বুঝে ঠিক হয় দল নির্বাচন। তাই হয়তো আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের লিগ ম্যাচে প্রায় তিনশো রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে ৯১ রানে সাত উইকেট পড়ে যাওয়ার পরও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট নিয়ে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে দুশো রান করে ম্যাচ জিতিয়ে দিতে পারেন। ৩৭ বছরের ওয়ার্নার বাউন্ডারি লাইনে বা এক্সট্রা কভারে ফিল্ডিং করে একার দক্ষতায় বাঁচিয়ে দিতে পারেন বিপক্ষের প্রায় সমস্ত বাউন্ডারি!

উইকেট শিকারের পর অস্ট্রেলিয়ার উচ্ছ্বাস

প্যাট কামিন্স শুধু অ্যাশেজ় এবং বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নেবেন বলে গত বছর আইপিএলে অংশ নেননি। ব্যাগি গ্রিনদের টুপির গরিমা ধরে রাখার জন্য এটুকু ক'জন করেন? বিশ্বকাপের আগে কামিন্সের বক্তব্যই ছিল, আবেগ সরিয়ে রেখে শুধু ক্রিকেট এবং পারফরম্যান্সে ফোকাস করেই ক্রিকেট খেলবেন। সেটাই করলেন তাঁরা। ম্যাচ অনুযায়ী দল বদল করে বিপক্ষের প্রত্যেক খেলোয়াড়ের জন্য আলাদা বোলিং এবং ফিল্ডিং আক্রমণ তৈরি করে এমন একটা জায়গায় দলের খেলাকে নিয়ে গেলেন, যা শুধু অজ়িদেরই মানায়। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম সফল অধিনায়ক রিকি পন্টিংয়ের বক্তব্য ছিল, "সবশেষে মনে থেকে যাবে, তুমি ফাইনালের দিন কেমন খেললে, সেটা।" সেমি-ফাইনালে ওঠার পর থেকে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক খেলোয়াড় সেই বাক্যটাকেই আত্মস্থ করে নিল। জীবনের শেষ ম্যাচ চলছে, এমন ভঙ্গিতে চলল খেলা। ম্যাচ-শেষে প্যাট তাই বলছিলেন, তাঁর দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় একটি কথা বিশ্বাস করে এসেছে, দলগত ভাবে। সেটা হল, "এখানে খেলোয়াড়ের কেরিয়ার খুব বেশি হলে দশ বছর। তাই দুটোর বেশি সুযোগ তাঁরা হয়তো অনেকেই পাবেন না। তাই যা হাতের কাছে আসছে, আগলে রাখো। নিজেকে উজাড় করে নিয়ে যাও তার কাছে।"

লাবুশেন এবং ট্রাভিস হেড

তাই হেড যখন ফাইনালে রোহিত শর্মার মিসহিটে অবিশ্বাস্য ক্যাচটি নিলেন এবং ৪৭ রানে তিন উইকেট পড়ে যাওয়ার পরেও এক দিক রক্ষা করে ১৩৭ রানের সাহসী ইনিংস খেলে দলকে জেতালেন, এই বাক্য যেন আরও

সত্যি হয়ে গেল। এবং আমাদের, মানে ভারতীয়দের কাছে হয়ে গেল হৃদয়ভঙ্গের। অবশ্য কামিন্সরা তো এটাই চেয়েছিলেন। দর্শকভরা স্টেডিয়ামে স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাওয়ার নিস্তব্ধতা। সেটাই তাঁদের কাছে তৃপ্তির, বিজয়ের। নির্মম অজিরা ঠিক যেমন হন আর কী! শুধু খারাপ লাগার রেশটা আরও একটা কারণে রয়ে গেল। একটা অদ্ভুত সমাপতনে। এ বারের বিশ্বকাপে ভারতের যে যাত্রাপথ, যে বিধ্বংসী পারফরম্যান্স, তা অনেকটাই মনে করিয়ে দিয়েছে ১৯৮৩ সালের ক্লাইভ লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজকে। আমাদের পেসত্রয়ী শামি-বুমরা-সিরাজ তো অনেকটাই ওয়েস্ট ইন্ডিজের মার্শাল, গার্নার এবং রবার্টসের প্রতিচ্ছবি বয়ে এনেছেন!

ট্রফি নিয়ে অজি দলের সদস্যরা

বিরাট ফিরিয়ে এনেছেন ভিভ রিচার্ডসকে। তুলনায় অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা অনেকটাই কপিল দেবের ভারতের মতো। শুরুর দিকে হার, খানিকটা হোঁচট এবং সেই ভাবেই এগোনো। কিন্তু পরে ঘুরে দাঁড়াল অস্ট্রেলিয়া। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে কপিল দেবের একার ১৭৫ রানের ইনিংসের মতো এ বারও ম্যাক্সওয়েল খেললেন আফগানদের বিরুদ্ধে। একার দমে ২০০ রান করে জেতালেন... এবং শেষে এলেন ট্র্যাভিস হেড। সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে একার হাতে জেতালেন দলকে। ফাইনালে রোহিতের যে অবিশ্বাস্য ক্যাচটা তিনি নিলেন, সেটা ১৯৮৩ সালে ভিভের বিরুদ্ধে পিছনে দৌড়ে কপিলের ক্যাচকে মনে করালেও, আদতে হেড হয়ে গেলেন মোহিন্দর অমরনাথ। দু'বার ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়ে।

আক্ষেপ এটাই যে, ১৯৮৩-র কপিলের নেতৃত্বে ভারতীয় দলের উত্থানের গল্পটা এ বার মিলে গেল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে। আন্ডারডগ হয়েও রূপকথা লিখলেন তাঁরা। আইসিসি এবং বিসিসিআই-এর গাফিলতির কারণে এ বার ফাইনালে মাঠে ডাক পাননি কপিল। যেন মাঠে অবাঞ্ছিত ছিলেন তিনি। অবাঞ্ছিত তো ছিল প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াও। সেই কারণেই হয়তো জেতার পরও দর্শকদের তরফ থেকে করতালি পাননি তাঁরা।

কিন্তু তাতে থোড়াই কেয়ার, ইতিহাসের পাতায় তো চলে গেল প্যাটিদের একাদশ! ছ'টি বিশ্বকাপ জিতে উজ্জ্বল রইল ব্যাগি গ্রিনের গরিমা। শেষে তো থেকে যাবে এইটুকুই!

.

ভাল-মন্দের বিশ্বকাপ

দুই ক্যাপ্টেন, রোহিত শর্মা ও প্যাট কামিন্স

এ বারের বিশ্বকাপ মনে থেকে যাবে বিশেষ কিছু কারণে। গোটা প্রতিযোগিতা জুড়ে ভারতের অসাধারণ পারফরম্যান্স যদি চুম্বক হয়ে থাকে, তা হলে অবশ্যই অপর চুম্বকের নাম আফগানিস্তান। যে অপ্রত্যাশিত ভাল ক্রিকেট খেলে তারা ইংল্যান্ড ও পাকিস্তানকে হারিয়েছে, তাতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলে দেওয়া যায় যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা ক্রিকেটে সুপার পাওয়ার হয়ে উঠবে। নেদারল্যান্ডসও তো দুর্বলতার কোনও চিহ্ন রাখেনি! বরং দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে গিয়েছে শেষ পর্যন্ত। নিউ জ়িল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন এবং নতুন প্রতিভা রাচিন রবীন্দ্রও কেড়ে নিলেন যাবতীয় স্পটলাইট। রাচিনের তিনটি শতরান কিউয়ি ক্রিকেটকে যেমন ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী করেছে, তেমনই কেনের আঙুলে চোট নিয়ে নিউ জ়িল্যান্ডকে সেমি-ফাইনাল এবং ফাইনালে তোলার মরিয়া লড়াই প্রমাণ করে দিয়েছে, কিউয়িদের সর্বকালের সেরা অধিনায়ক তিনিই। এবং তিনি হয়তো কেরিয়ারের শেষ বিশ্বকাপটি খেলে ফেললেন। অবশ্য কালিমা যে নেই, তা নয়। ক্রিকেটের নিয়মের মধ্যে থেকেও শাকিব আল হাসান যে ভাবে শ্রীলঙ্কার অ্যাঞ্জেলো ম্যাথিউসকে ‘টাইম আউট’ করলেন, তাতে বহু সমালোচক তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হয়েছেন। আসলে ক্রিকেটের মাঠ সব সময় চারিত্রিক দৃঢ়তা প্রকাশ করে। সেটাই ধরা পড়ল এ বার, গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে। খাতায় কলমে সবচেয়ে শক্তিশালী দল হয়েও, বিশ্বকাপে ধরাশায়ী হল ইংল্যান্ড। বড় প্রতিযোগিতার চাপ এ বার ধরে রাখতে পারল না পাকিস্তান। তবে হ্যাঁ, এ বারের বিশ্বকাপ আগামীর বার্তা দিয়ে গেল। ২০২৭ সালে যদি ১৪টি দলের মধ্যে বিশ্বকাপ হয়, তা হলে অবশ্যম্ভাবী ভাবে আরও অনেক চমক অপেক্ষা করে থাকবে।

ছবি: সুমন পাল

মিষ্টির গল্প

গত কাল দিনটা তার ভাল যায়নি। ভোলা এসে খবর দিয়েছিল, ভবনাথ নাকি ‘যেমন খুশি খাও’ গত কাল বিক্রিই করেনি। কিন্তু কেন? ভবনাথ কি ধরে ফেলেছিল তার চাল? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রমাপদ। ভোর হতেই শিবেনকে দেখে আর শিবেনের মুখে এমন কথা শুনে রমাপদ ভুলেই গেল সব দুশ্চিন্তার কথা।

ভবনাথ হালদার বললেন, "নে, নে, হাত চালা। রসগোল্লার ডেকচিটা নিয়ে আয় জলদি। মৌচাকের নৌকোটা ভরে রাখ। আর শোন, যেমন খুশি শেষ প্রায়। শিবেনকে শিগগির জানা।"

রোজ সকাল থেকেই এমন হাঁকডাক করতে থাকেন ভবনাথ হালদার। তিনি ভবনাথ মিষ্টান্ন ভান্ডারের মালিক। গ্রামের বহু পুরনো মিষ্টির দোকান। এক কালে এটিই ছিল এই হ্যালাপুকুর গ্রামের এক মাত্র মিষ্টির দোকান। ফলে সকাল সন্ধে ভিড় লেগেই থাকত। বছর দেড়েক আগে মাইল পাঁচেক দূরেই নতুন একটি মিষ্টির দোকান দেয় পঞ্চানন মজুমদারের ছেলে রমাপদ মজুমদার। নামখানাও জম্পেশ। দরবারি সুইট্স। মিষ্টিগুলোও সব হাল আমলের। গাঁয়ের ভিড় সে-ই সব টানতে থাকে। ভবনাথ মিষ্টান্ন ভান্ডার সকাল-সন্ধে শুধু মাছি তাড়ায়।

তবে হপ্তাখানেক হল এই অবস্থার আমূল বদল ঘটেছে। এখন দম ফেলার ফুরসত পায় না ভবনাথ। কারণ একটাই। দোকানে যোগ দিয়েছে নতুন ময়রা শিবেন আর সে এনেছে এক নতুন মিষ্টি- যেমন খুশি খাও। দোকানের এই মিষ্টি খেলেই যে কেউ প্রতি কামড়ে ফিরে পেতে পারে তার পুরনো কোনও খাবারের স্বাদ। মানে ধরুন আপনি ছোটবেলায় আপনার পিসিমার হাতে মুলোশাক খেয়েছিলেন। এখন পিসিমাও নেই আর সেই রান্না করে দেওয়ার মতোও কেউ নেই। আপনি হয়তো চাইলেন সেটা ফিরে পেতে। তা হলে আপনাকে খেতে হবে ভবনাথের দোকানের 'যেমন খুশি খাও' মিষ্টি। আর খাওয়ার আগে অবশ্যই ওই স্বাদটার কথা মনে আনতে হবে। তা হলে প্রতি কামড়ে ফিরে পাবেন পুরনো সেই মুলোশাকের স্বাদ। কী নস্টালজিক ব্যাপার বলুন তো। এমন ম্যাজিকের স্বাদ পেতে মুখিয়ে থাকে গাঁয়ের সব লোক।

রাতের আঁধার গাঢ় হয়ে এলে তবেই নতুন ময়রা মিষ্টি গড়তে বসে। তার এই মিষ্টির স্পেশ্যাল রেসিপি পাওয়ার জন্য কম কসরত করেনি ভবনাথের চির-প্রতিদ্বন্দ্বী রমাপদ মজুমদার। কিন্তু লাভের লাভ হয়নি। নতুন হালুইকর শিবেনের সেই এক গোঁ। গুরুর নাকি আদেশ আছে যে তাকে এই দোকানেই মিষ্টি বানাতে হবে। গুরুর অমর্যাদা সে করতে পারবে না। শিবেনকে রাজি করানো গেল না দেখে অন্য ফন্দি আঁটল রমাপদ। যে করেই হোক গাঁয়ের সেরা মিষ্টির দোকানের তকমা পুনরুদ্ধার করতেই হবে তাঁকে। তার জন্য সোজা পথে কাজ হাসিল না হলে বাঁকা পথই সই। ভবনাথের দোকানেই কাজ করে ব্যাচা। মিষ্টি গড়ে। সাধারণ মিষ্টি যেমন ক্ষীর কদম, চমচম, ছানাবড়া, জিলিপি, গুজিয়া- এই সব। টাকার লোভ দেখিয়ে রমাপদ হাত করল ব্যাচাকে।

রমাপদর পরামর্শ মতো ব্যাচা সেই রাতেই মিষ্টির দোকানের পিছনে আড়তে লুকিয়ে রইল। অপেক্ষা করতে লাগল সঠিক সময়ের। শিবেন প্রতি দিনের মতোই মিষ্টি বানিয়ে ঢাকা দিয়ে ভাঁড়ার বন্ধ করে চলে গেল। ব্যাচা চার পাশ জরিপ করে সন্তর্পণে পিছনের দরজা খুলে ঢুকল। তার পর ভাল করে

জোলাপ মিশিয়ে দিল তাতে।

পর দিন সকালে যথারীতি দোকান খুলল। ভবনাথ ভারী ব্যস্ত। হাঁক দিল, "ওরে শিবেন, যেমন খুশি নিয়ে আয়।"

"কত্তা, আজ আর যেমন খুশি দিতে পারুম না," মুখ নিচু করে জানাল শিবেন।

"সে কী রে! তবে বেচব কী?"

"আজ মাপ করেন কত্তা। যা পারেন ব্যাচেন। যেমন খুশি দিতে পারুম না।"

"কেন? বানাসনি কাল?"

"বানাইছিলাম কত্তা। কিন্তু তার পর অতে কেডা যেন জোলাপ মিশাইয়া রাখসে। আমি ভাগ্যিস সকালে আইসাই এক খান নিজে খাইয়া দোকানে রাখি! না হইলে কী হইত ভাবেন। ও বাবা গো, আবার যাইতে হইব..." শিবেন ফের ছুটল।

ভবনাথের মাথায় হাত পড়ল। ব্যাচা সে দিন আর ভয়ে মিষ্টির দোকানমুখো হয়নি। শিবেনও পেটের ওই অবস্থা নিয়ে আর দোকানে বসতে পারেনি। মনোহর বদ্যির বাড়ির দিকে রওনা দিল তড়িঘড়ি। পথে ব্যাচার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় শিবেনের। ব্যাচা শিবেনকে দেখেই কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। তার পর হঠাৎই জিজ্ঞেস করে, "আজ তো দোকানে যেতে পারলাম না। মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক এসেছিল। তা তোমাদের শরীর- গতিক ভাল তো?"

শিবেন একটু হেসে বলে, "কেন বলো তো? হঠাৎ এই প্রশ্ন! শরীর খারাপ হওয়ার মতো কিছু কারণ ছিল বুঝি?"

ব্যাচা কোনও রকমে সামলে নিয়ে বলল, "না না, এমনি। আচ্ছা চলি বুঝলে। গিন্নি ফর্দ দিয়েছে। নিয়ে যেতে হবে সব মিলিয়ে। না হলে বোঝোই তো! হে হে..." শিবেনের মনের মধ্যে ব্যাচাকে নিয়ে সকাল থেকে সন্দেহটা চেপে বসেছিল। তা পোক্ত হল আরও। শুধু ভাবতে লাগল, 'শুধুই কি ব্যাচা, নাকি নেপথ্যে আছে রমাপদ? ভবনাথের ক্ষতি হলে তো সবচেয়ে বেশি লাভ তারই।'

সে দিনই সন্ধেবেলা শিবেন কড়া নাড়ল বিষ্ণুচরণের বাড়ির দরজায়, "কত্তা আছেন?"

কত্তা মানে বিষ্ণুচরণ তলাপাত্র। হ্যালাপুকুর গাঁয়ের পশ্চিমের শেষ মাথায় ঝিলের গা ঘেঁষে তাঁর ছোট্ট একটা ভাঙাচোরা একচালা বাড়ি। আসলে বিরাট মাপের বিজ্ঞানী। দেশে-বিদেশে তাঁর খ্যাতি। গাঁয়ের লোক যদিও সে সব খবর রাখে না। তারা তাঁকে হাফ প্যান্ট-পরা অবস্থায় গাঁ ছাড়তে দেখেছে। তার পর আর কেউ তেমন তাঁর আপন ছিল না যারা তাঁর খোঁজখবর রাখবে।

মাস খানেক হল নিজের জরাজীর্ণ ভিটেয় ফিরেছেন বিষ্ণুচরণ। তেমন মিশুক

নন। তাঁর কাজের খোঁজও কেউ রাখে না। রাখলে জানতে পারত, এই শিবেন আসলে তাঁরই জুনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট। আর এমন স্মৃতি উদ্রেককারী যেমন খুশি খাও মিষ্টির আবিষ্কারটিও তাঁর। ভবনাথের দোকান তিনি বেছে নিয়েছেন। কারণ, এক কালে ছেলেবেলায় তিনি যখন মা-বাপকে হারিয়ে অনাহারে প্রায় মরতে বসেছিলেন, সেই সময় রোজ দু'বেলা সামর্থ্য মতো কচুরি, মিষ্টি, রুটি দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছিল এক মাত্র এই ভবনাথই।

দোকানের সামনে গেলেই যা পারত, দিত। গাঁয়ের অন্য কেউই তখন পাশে দাঁড়ায়নি। এমনকি পঞ্চানন মজুমদারও নয়। পঞ্চার তখন ছিল ভাতের হোটেল। কাছে গেলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দিত। যেন রাস্তার বিড়াল-কুকুর। সব মনে আছে বিষ্ণুচরণের। তা ছাড়া বিষ্ণুচরণের কাছে খবর আছে, ভবনাথের এখন সত্যি অর্থের প্রয়োজন। ভবনাথের ছেলে ভুগছে দুরারোগ্য ব্যাধিতে। শিবেনের কাছে পঞ্চার পো রমাপদর ব্যাপারে সব খবরই পেয়েছিলেন। আজকের ঘটনা যে রমাপদরই কারসাজির ফল, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। গত কাল সকালে পাড়ার মদনের দোকানে চা খেতে গিয়ে শুনেছেন, মনোহর বদ্যি বলছে, "বুঝলে ভায়া, আজকাল সবেতে ভেজাল। জল খেলেও বাহ্যি কষে যাচ্ছে। এই যে দেখো রমাপদ। বেচারার নাকি সাত দিন ইয়ে হচ্ছে না। শেষে ভোলাকে দিয়ে দোকান থেকে এক শিশি জোলাপ কিনে নিয়ে গেল।"

বিষ্ণুচরণ শিবেনের মুখে আজ সব শুনে ভাবতে লাগলেন নানা কথা। হঠাৎই একটা বুদ্ধি এল মাথায়। সেই মতো শিবেনকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিলেন সব। পর দিন দোকান খুলতেই চমকে গেল রমাপদ। সামনেই দাঁড়িয়ে শিবেন।

"কত্তা, শরীর ঠিক আছে তো?" প্রশ্ন শুনে চমকালেও গম্ভীর মুখে বললেন, "তোমার কি দরকার তাতে? আজ ভবনাথের দোকান ছেড়ে এখানে কেন? যখন ডেকেছিলাম তখন তো আসোনি।"

শিবেন হাত কচলে বলল, "আজ্ঞে বাড়িতে ট্যাকার বড় দরকার। বৌয়ের শরীরটা ভাল না। এ দিকে মহাজন তাগাদা দিতাসে বার বার। বাড়ি বানানের লেইগ্যা অনেকগুলান ট্যাকা ধার কইরা ফেলছি। কিন্তু ভবনাথ কত্তা আর মজুরি বাড়াইতে পারবো না কইয়া দিসে। তাই আমি আজ থেইক্যাই আপনের এখানে মিষ্টি বানামু। অবশ্যি যদি আপনে রাজি থাকেন তবেই।"

রমাপদ মনে মনে ভাবতে লাগল, 'আজ কার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি। এ যে দেখছি মেঘ না চাইতেই জল।'

গত কাল দিনটা তার ভাল যায়নি। ভোলা এসে খবর দিয়েছিল, ভবনাথ নাকি যেমন খুশি খাও গত কাল বিক্রিই করেনি। কিন্তু কেন? ভবনাথ কি ধরে ফেলেছিল তার চাল? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল রমাপদ। ভোর হতেই শিবেনকে দেখে আর শিবেনের মুখে এমন কথা শুনে রমাপদ ভুলেই গেল সব দুশ্চিন্তার কথা। শিবেন নয়, স্বয়ং সৌভাগ্য এসে

কড়া নেড়েছে তার দরজায়। গদগদ হয়ে বলল, "তা বেশ তো। আজ থেকেই লেগে পড়ো কাজে। যা দেব বলেছিলাম, তা-ই পাবে। আমি ভবনাথের মতো কেপ্পন নই, বুঝলে তো। হে হে..."

কথা ফুরোনোর আগেই শিবেন বলল, "সে ঠিক আছে। তবে একখান শর্ত ছিল কত্তা।"

একটু বিরক্ত হয়ে রমাপদ বলল, "কী শর্ত আবার? মজুরি বাড়াতে হবে?"

শিবেন হেসে বলল, "না কত্তা। আর চাই না। তবে কিনা এত দিন ভবনাথ সুইট্সে যে মিষ্টি বানাইসি তা আর বানামু না। নতুন দোকান নতুন মিষ্টি। হাসিমুখি, ঘুমভরা, দুখীমন্ডা এই তিনখানা একই ছাঁচের মিষ্টি গড়ুম। নামেই মালুম এদের কাজ। হাসিমুখি খাইলে বসন্তের বাতাসের মতো ফুরফুরে লাগব মন। ঘুমভরা খাইলে সঙ্গে সঙ্গে এমন ঘুম ঘুমাইব যে কুম্ভকর্ণ অব্দি লজ্জা পাইব। দুখীমন্ডা দেওয়া যাইতে পারে কারও উপর যদি রাগ থাকে, তারে ঘুরাইয়া শায়েস্তা করনের ইচ্ছা জাগলে। খাইলে পরেই চোখের জলে নাকের জলে একাকার হইব। আর এগুলান যেহেতু স্পেশ্যাল মিষ্টি, তাই খোলা দোকানে রোজ খুচরো বিক্রি করা যাইব না। পার্বণে, অনুষ্ঠানে লোকে অর্ডার দিলে তবে বানামু। খরিদ্দার পিছু এক রকম মিষ্টিরই অর্ডার নিমু।"

শিবেনের সব শর্ত মেনে নিল রমাপদ। আবার সকাল থেকেই লোকের লাইন লাগল দরবারি সুইট্সের সামনে।

প্রথম প্রথম ভালই চলছিল। তিনটে মিষ্টিই সুপারহিট। সকাল হতেই অর্ডার দেওয়ার লাইন পড়ত দোকানের সামনে। কিন্তু গোল বাধল কিছু দিন পর থেকে। পরীক্ষার হলে ঢোকার আগে হাসিমুখি ভেবে ঘুমভরা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল গাঁয়ের সিদ্ধেশ্বরী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণীর হল পরিদর্শক ভূগোল-শিক্ষিকা অনামিকা দেবী। তার আর পরীক্ষায় গার্ড দেওয়া হল না। কী করে দেবে? অনেক চেষ্টাচরিত্তির করেও রাতের আগে ঘুম ভাঙল না যে। স্কুলের ছাত্রী, সহকর্মীদের কাছে মুখ দেখানোর জো রইল না। অনামিকা দেবী দোকানে এসে অনেক গোল বাধালেও দরবারি সুইট্সের মিষ্টির জনপ্রিয়তার তোড়ে সেই অভিযোগ তেমন ধোপে টিকল না। যাই হোক, মোটের উপর সে যাত্রা পার পেয়ে গেল দরবারি সুইট্স আর তার মালিক রমাপদ। যদিও রমাপদর মন একটু খচখচ করতে লাগল এই ভেবে যে, এমন ভুল হল কী করে!

কিন্তু বার বার তো এড়ানো যায় না বিপদ। দু'-এক দিন পরই আবার অঘটন ঘটল। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে সে দিন বিকেলে অস্থির অস্থির করছিলেন থানার বড়বাবু। যন্ত্রণার কারণও ছিল। গাঁয়ের শিল্পী চোর হাবু আবার থানার মধ্যে থেকে সাইকেল চুরি করে পালিয়েছে। এত পুলিশ মায় ক্লোজ়ড সার্কিট ক্যামেরা হাবু তো দূর, হাবুর ছায়ার অবধি নাগাল পায়নি। হাবু ফোন করে আবার ধন্যবাদ জানিয়েছে বড়বাবুকে, "বুইলেন সাহেব, সাইকেলটা খুব দরকার ছিল। রাতবিরেতে কাজে বেরোতে হেব্বি সুবিধে হবে। থানকুউ!"

শুনে থেকে বড়বাবু "ফুলিশ, ফুলিশ," বলে লাফাচ্ছেন আর মাথায় মলমপট্টি করছেন। মেজোবাবু সেই দেখে বড়বাবুর জন্য কনস্টেবল রঘুকে দিয়ে খান তিরিশ ঘুমভরা আনালেন দরবারি সুইট্স থেকে। বড়বাবুও বিনা বাক্যব্যয়ে ঘুমভরা ভেবে দোকান থেকে ভুল করে পাঠানো দুখীমন্ডা খেয়ে ফেললেন। ব্যস, হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেল থানায়। গারদের ভিতরে আর বাইরে যারা ছিল, রেহাই পেল না কেউই। পর দিনই সকালে রমাপদকে থানায় ডেকে পাঠালেন মিষ্টির দোকানের লাইসেন্স চেয়ে। লাইসেন্সের মেয়াদ ফুরিয়ে গেছিল বহু কাল আগেই। বিপদ আঁচ করে রমাপদ তড়িঘড়ি ডেকে পাঠালেন শিবেনকে।

শিবেন জোর গলায় জানাল, "ক্যাশিয়ার উমাপতিবাবু নিজে খাতা দেইখ্যা রোজ আমারে কইয়া দ্যান স্পেশাল মিষ্টি কোন রকমের ক'টা বানাইতে হইব। সেই মতোই বানানো হয়। এই বার সে সব কার কাছে যায় সেই খোঁজ আমি রাখি না। সব তো একই দ্যাখতে। তাই হয় তো উমাবাবু প্যাকেট বাঁধার সময় গুলাইয়া ফ্যালছেন।"

রমাপদ সিদ্ধান্ত নিল, এ বার থেকে নিজের হাতে অর্ডার নেবে। কিন্তু এত সহজে রমাপদকে নিষ্কৃতি দিলে চলবে কেন? শিবেনের কাছে খবর ছিল পর দিন বড় অর্ডার আসবে। তাই বলল, "বাবু, চিন্তা নাই। আপনে কাল থানায় গিয়া খান পঞ্চাশ হাসিমুখি দিয়ে আসেন। দ্যাখবেন বড়বাবু খুশি খুশি লাইসেন্স রিনিউ কইরা দিব। আমার হাতে জাদু আছে কত্তা। যান, ভাইবেন না।"

রমাপদ আমতা আমতা করে বলল, "কিন্তু কাল দোকান কে সামলাবে? আবার যদি অর্ডার গোলমাল হয়! দু'বার জোর বিপদ থেকে বেঁচেছি। আর-এক বার হলে ব্যবসা লাটে উঠবে।"

শিবেন আশ্বস্ত করে বলল, "আপনে বরং কাল আপনার ছেলেকে ওইটুক সময় দোকানে বসাইয়া যান। এক দিন নয় কলেজ যাইতে একটু দেরি হইব, এই যা।"

প্রস্তাবটা মনে ধরল রমাপদর। শিবেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। পর দিন রমাপদ চলে গেলে রমাপদর ছেলে দোকানে বসল বটে, কিন্তু মন তার সর্ব ক্ষণ মোবাইল ফোনে। শিবেন জানত ছেলের চরিত্র। তাই ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। অর্ডার এলে শুনছিল শিবেন শুধু। সেই শুনে যেমনটি শিবেন বলছিল, তেমনই খাতায় মোবাইল দেখার ফাঁকে দায়সারা লিখে নিচ্ছিল রমাপদর ছেলে শুভায়ু। সেই তালিকায় ছিল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ের বিয়ের তত্ত্বের মিষ্টিও।

দু'দিন পর রমাপদ সবে দোকানের দিকে বেরোতে যাবেন, উমাপতিবাবুকে দেখলেন শশব্যস্ত হয়ে ছুটে আসতে, "সব্বোনাশ হয়ে গেছে কত্তা! কাল ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাড়ির তত্ত্বে নাকি হাসিমুখির বদলে দুখীমন্ডা গেছে। সেগুলো খেয়ে নাকি পাত্রপক্ষের বাড়ির লোকজন সবাই খুব মুষড়ে পড়েছে।

নতুন বৌকে ঘরে বরণ করার পরই পাত্রপক্ষের লোকজনের মধ্যে ওই মিষ্টি বিতরণ হয়েছিল। ওই নতুন বৌয়ের হাত দিয়েই হয়েছিল সে সব। এখন নাকি ওই বাড়িতে কান্নাকাটির আসর বসে গেছে। সেই দেখে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মেয়ে নাকি খুব ঘাবড়ে গেছে।"

খবরটা পাওয়ার পর আর দাঁড়াল না রমাপদ। সাততাড়াতাড়ি অনির্দিষ্ট কালের জন্য দোকান বন্ধের নোটিস উমাপতির হাতে ধরিয়ে দিয়ে ছেলেকে নিয়ে দৌড় দিল স্টেশনের দিকে। এই ঘটনার পর কেটে গেছে ছয়-ছয়টি বছর। রমাপদ এখন কাপড়ের দোকান দিয়েছে। লোকে আজও তাকে পথেঘাটে দেখলে সেই ঘটনা নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করে। ভবনাথ মিষ্টান্ন ভান্ডার কলকাতা থেকে নতুন ময়রা এনেছে। গাঁয়ের একমাত্র মিষ্টির দোকান হিসেবে তার ভালই লক্ষ্মীলাভ হচ্ছে। সে-ই এখন গাঁয়ের সেরা মিষ্টি ব্যবসায়ী। তবে সে দিনের পর শিবেন আর বিষ্ণুচরণকে আর দেখা যায়নি গাঁয়ে। তবে ব্রজনাথ হাই স্কুলের ক্লাস সিক্সের ফার্স্ট বয় তুষারকান্তি বাগচী গতকাল তার বাবাকে বিদেশি জার্নালে প্রকাশিত একটা খবর দেখিয়েছে। তাতে নাকি লেখা ছিল এক দল বিজ্ঞানী একটি ফর্মুলা আবিষ্কার করেছেন। সেটি কোনও খাবারের মধ্যে প্রয়োগ করলে খাবারটি খাওয়ার সময় যিনি খাচ্ছেন, তিনি মস্তিষ্কে যে-খাবারের স্বাদ পাওয়ার কথা ভাবছেন, সেই স্বাদ সঙ্কেত আকারে স্নায়ুবাহিত হয়ে জিভের স্বাদকোরককে এমন ভাবে উদ্দীপিত করতে সক্ষম যাতে লোকে রসগোল্লার মধ্যেও নিমবেগুন ভাজার স্বাদ কিংবা আলুসেদ্ধ-ভাত মুখে দিয়ে বিরিয়ানির স্বাদ পেতে পারে। কী দারুণ ব্যাপার না? ও হ্যাঁ, সেই বিজ্ঞানীদের মধ্যে এক জন ভারতীয়ও ছিলেন। নাম বিষ্ণুচরণ তলাপাত্র।
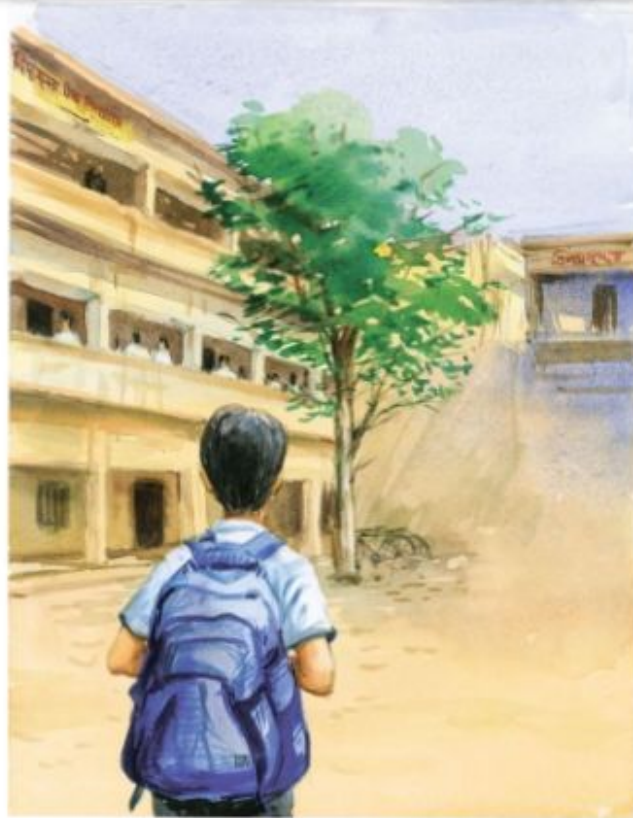
ছবি: তারকনাথ মুখোপাধ্যায়

রাতুলের নতুন স্কুল

কৌশিক কারক

আজ সকাল থেকেই মন খারাপ রাতুলের। স্কুল খুলছে আজ প্রায় বছর দুয়েক বাদে। যদিও মাঝখানে কিছু দিনের জন্য খুলেছিল, তবুও সেই সময় খালি ওর দাদারাই স্কুলে গিয়েছিল। ওদের ক্লাসের জন্য নাকি স্কুল খোলেনি। কিন্তু এ বার আর সে রকম নয়, সবার স্কুলই খুলেছে এ বার।

রাতুলের দাদা, মানে ওর জেঠুর ছেলে দেবজ্যোতিরও আজ থেকেই স্কুল খুলছে। ওর থেকে দু'বছরের বড়। এ বার ক্লাস এইটে উঠল। রাতুলের ক্লাস সিক্স এ বার। কিন্তু ওর মন ভাল নেই। কারণ ও এ বার থেকে নতুন স্কুলে যাবে। আগে যে স্কুলে পড়ত, সেখানে আর যাবে না ও। বদলে ওদের গ্রামেরই হাই স্কুলে যাবে।

এই নতুন স্কুলটাকে কোনও ভাবেই ভাল লাগে না ওর। ওর আগের স্কুলের নাম ছিল মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। যেমন নাম তেমন স্কুল। বিরাট বড় বিল্ডিং, বড় বড় চকচকে ক্লাসরুম, ওদের বাড়ির চেয়েও পরিষ্কার বাথরুম। স্কুল ভ্যানে করে রোজ সকালে স্কুলে যেত। গাড়িতে যেতে যেতেও সবাই ইংরেজিতে কথা বলত। আর ওর কাছে সবচেয়ে ভাল ছিল স্কুলের কম্পিউটার রুম। ওর মনে হত, সারাটা দিন যদি স্কুল চলে তা হলে ভালই হয়। কিন্তু কোথা থেকে কী যে হল, এক দিন শুনল আর স্কুলে যাওয়া যাবে না, স্কুলে গেলেই নাকি করোনা ভাইরাস ঢুকে যাবে। প্রথমে এক মাস, তার পর তিন মাস, এ ভাবে চলতেই থাকল। তার পর বাবার মোবাইলে শুরু হল অনলাইন ক্লাস। স্কুলের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাও হল মোবাইলে।

এ ভাবেই চলছিল, কিন্তু তার পর এক দিন হঠাৎ বাবা বলল আর অনলাইন ক্লাস করতে হবে না। কেন করতে হবে না, সেটা জানতে পারেনি রাতুল। পরে মা বলেছিল, অনলাইন ক্লাস নাকি এখন বন্ধ আছে। মনে মনে সে দিন খুব রাগ হয়েছিল কোভিডের উপর। সেই যে এসেছে, স্কুলগুলো থেকে আর যেতেই চায় না। তার পরে এক দিন— সে দিন বাবা ঘরে ছিল না, মা শ্যামকাকার দোকানে চিনি আনতে পাঠিয়েছিল রাতুলকে। ফেরার সময় ওর দেখা হয়েছিল ওর ক্লাসেরই বন্ধু অমিতের সঙ্গে। অমিতের কাছ থেকেই ও জানতে পেরেছিল স্কুলের অনলাইন ক্লাস চলেছে, আর কয়েক দিন বাদেই নাকি অ্যানুয়াল এগজাম। বাড়ি ফিরে এসে মাকে বলেছিল সব কথা। আর সে দিনই ও জানতে পেরেছিল, এ বার থেকে আর মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নয়, গ্রামের বিদ্যাসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র ও। বাবা নাকি কয়েক মাস আগেই ওকে ভর্তি করে দিয়েছেন এই স্কুলে। এর পরে যখনই স্কুল খুলবে, তখন ও নতুন স্কুলেই যাবে। রাতুল ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি এত দিন অবধি যাদের সঙ্গে খেলতে-মিশতে মানা করত ওর মা-বাবা, আজ সেই ছেলেগুলো যে স্কুলে পড়ে, সেই স্কুলেই ওকে কেন ভর্তি করা হল।

এমনিতেই এই স্কুলের নামটা ওর একদমই পছন্দ নয়। কী রকম যেন! আর তা ছাড়াও দুপুরে স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখেছে ওই স্কুলের ছেলেমেয়েরা সব থালা নিয়ে গাছের তলায় বসে স্কুলড্রেস পরেই ভাত খায়। ওদের স্কুলে তো টিফিনে কেউ ভাত নিয়ে যায় না। এটা নিয়ে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসিও করত সবাই।

আর তা ছাড়া এক বার বাবার সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিনে গিয়েছিল ওখানে।

গিয়ে একটা ক্লাসের মধ্যে ঢুকেছিল। কী সরু সরু বেঞ্চ, ক্লাসে ফ্যান নেই, সিঁড়িতে ধুলো। খালি এক দিকে একটা জায়গায় প্যান্ডেল করে পুজো হচ্ছিল। তার পর দেখেছিল সবাই খালি হাতে প্রসাদ নিচ্ছে। ওর স্কুলে কোনও ফাংশনে ওদের প্যাকেটে করে টিফিন দেওয়া হয়। কেক, চিপ্‌স, কোল্ড ড্রিঙ্কস এই সব থাকে। সে দিনও সেখানে বেশি ক্ষণ থাকেনি, থাকতে ভালও লাগেনি। আজ সেই স্কুলেই ওকে যেতে হবে ভেবেই ভয় পাচ্ছে ও। এ দিকে ওর বন্ধু অমিত, রবিন, সৌভিক এরা সবাই মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলেই যাবে। ওরা যদি দেখে রাতুল এই স্কুলে যাচ্ছে, তা হলে ওরাও রাতুলকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। রাতুল এখন কিছুটা হলেও বুঝতে পারে। ওর বাবা আগে একটা অফিসে যেত রোজ। কিন্তু এখন আর যায় না। এখন ওদের বাড়িতেই বাবার একটা নতুন দোকান হয়েছে। আগে ওরা শ্যামকাকার দোকান থেকে জিনিস কিনত। কিন্তু এখন ওদের নিজেদের দোকান থেকেই সব জিনিস আসে। আবার অনেকে ওদের দোকান থেকে নিয়েও যায় জিনিস কিনে। যদিও বাবা ওকে দোকানে নিজের সঙ্গে বসতে দেয় না, তবুও ওর দেখতে ভালই লাগে। এখন আর বাবা সারা দিন বাইরে থাকে না। যখন ইচ্ছে হয় বাবার সঙ্গে ও ক্যারাম খেলতে পারে।

আর ওর মা-ও তো তা-ই। আগে ওর মা-ও একটা অফিসে যেত। সেই সন্ধেয় ফিরত। কিন্তু এখন মা ঘরেই থাকে। আগে শুধু দাদুর সঙ্গেই খেলত রাতুল। কিন্তু এখন বাবা আর মা দু'জনের সঙ্গেই খেলে ও। মা তো ওকে পড়াতেও বসে। মায়ের কাছে পড়তে খুব ভাল লাগে ওর।

কিন্তু শুধু এই স্কুলটায় যদি না যেতে হত, তা হলে সব ভাল হত। কিন্তু ও জানে, যেতে তো হবেই। বাবার হাত ধরে স্কুলের সামনে এল রাতুল। বাবা বলল, "দেখো রাতুল, তুমি হয়তো জানো যে এই স্কুলে আমি, জেঠু এমনকি তোমার দাদুও পড়াশোনা করেছেন। এই স্কুল কিন্তু অনেক দিনের পুরনো। আমি জানি তোমার হয়তো এই স্কুলে পড়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি খুব বেশি দিন তোমাকে এই স্কুলে পড়তে হবে না। আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমাকে আগের স্কুলে আবার ভর্তি করে দেব। কিন্তু তত দিন তুমি কিন্তু ভাল ভাবে এই স্কুলে থাকবে। কারও সঙ্গে ঝগড়া করবে না। স্যরদের কথা শুনবে। আর মন দিয়ে পড়া করবে।"

বাবার কথাগুলো শুনে রাতুলের মনটা খারাপ হয়ে গেল। ওর কেন জানি মনে হল কথাগুলো বলতে গিয়ে বাবারও মন খারাপ হয়ে গেছে। ও তাড়াতাড়ি বলল, "চিন্তা করবে না বাবা। আমি একদম গুড বয় হয়ে থাকব।"

রাতুল তার পরে বাবার হাত ধরেই স্কুলের ভিতরে এল। বাবা ওকে নিয়ে গেলেন একটা ঘরে। রাতুল দেখল দরজায় লেখা আছে, হেডমাস্টার্স রুম। ভিতরে ঢুকে দেখল এক জন লোক চেয়ারে বসে আছেন। বাবা ওকে আগেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন প্রণাম করতে হবে বলে। রাতুল তা-ই করল। জানল ইনিই হেডমাস্টার। বাবা ওঁর সঙ্গে কিছু কথা বলে বেরিয়ে গেল। বাবা চলে যাওয়ার পর হেডমাস্টার রাতুলকে বললেন, "তুমি আমার সঙ্গে এসো।"

রাতুল ওঁর পিছনে পিছনে চলল। একটার পর-একটা ঘর পেরিয়ে এসে থামল ওরা। ঘরে ঢুকেই ও অবাক হয়ে গেল। একটা বেঞ্চে গাদাগাদি চার জন করে বসে আছে। আগের স্কুলে একটা ডেস্কে এক জন করে বসত। রোল নম্বর

অনুযায়ী ডেস্ক ঠিক করে দেওয়া থাকত। ও কী করে এই ভাবে ঠাসাঠাসি করে...

"রাতুল, এ দিকে এসো।"

নিজের নাম শুনে তাকিয়ে দেখল হেডমাস্টার ওকে ডাকছেন।

"এটা তোমার ক্লাস। তুমি যেখানে ইচ্ছে বোসো। আর এই হলেন সৌর স্যর, তোমার ক্লাসটিচার।"

সারা দিন কোনও মতে স্কুলে কাটিয়ে ঘরে ফিরল রাতুল। বাবার উপরে আজ ভীষণ রাগ হচ্ছে, এই স্কুলে কী করে ও পড়বে? সবাই বাংলায় কথা বলে, এমনকি স্যর-ম্যাডামরাও। বাথরুম খুব খারাপ, নোংরা। আর অনেকে আবার টিফিনের সময় ক্লাসের মধ্যেই থালায় ভাত নিয়ে এসে খায়। কিন্তু বাবাকে এ সব বললে হয়তো বাবার মন খারাপ হবে। আর তা ছাড়া বাবা তো বলেইছে, আগের স্কুলে আবার ভর্তি করিয়ে দেবে। রাতুল জানে মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সঙ্গে আর-একটা জায়গায় ওর নতুন স্কুল আলাদা। ওর আগের স্কুল থেকে ব্যাগ, বই, খাতা, ড্রেস সব কিনতে হত, আর এই স্কুলে সব ফ্রি-তে দেয়, এমনকি দুপুরের ভাতটাও।

রাতুল এ বার ক্লাস টেনে উঠল। সামনের বছর মাধ্যমিক দেবে। এখনও ও বিদ্যাসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র। আর এখন ও এটাও জানে যে, আগের স্কুলে আর ভর্তি হওয়া হবে না ওর। এখন আরও ভাল ভাবে বোঝেও সব। বাবা আর মা দু'জনেই প্রাইভেটে চাকরি করত। কোভিডের সময় দু'জনেরই চাকরি চলে যায়। তাই মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনার খরচ তারা আর চালাতে পারেনি। বাবা এখনও দোকানটাই চালায়, আগের চেয়েও বড়ও হয়েছে সেটা। কিন্তু...

রাতুল অবশ্য এই স্কুলে পড়াশোনায় কোনও ফাঁকি দেয় না। প্রতি বছর খুব ভাল নম্বর পেয়ে ফার্স্ট হয়। স্যর, ম্যাডামরাও ওকে খুব ভালবাসেন। প্রথম প্রথম কিন্তু-কিন্তু লাগলেও, এখন যদি কোনও জায়গায় বুঝতে অসুবিধে হয়, তা হলে ওঁদের এক বার বললেই যত্ন করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু তবুও কোথাও যেন একটা খচ খচ করে।

আগের স্কুলে বন্ধুদের মধ্যে অমিতের সঙ্গে সামান্য যোগাযোগ থাকলেও বাকিদের সঙ্গে আর তেমন কোনও কথা নেই রাতুলের। অবশ্য ও নিজেই ইচ্ছে করে এড়িয়ে চলে। জানে এই স্কুলে থেকে ও যত ভাল রেজ়াল্টই করুক না কেন, ওদের সঙ্গে পাল্লা আর দিতে পারবে না। আর সেই জন্যই গত দিন তিনেক ও স্কুলে যায়নি। কারণ কয়েক দিন আগে স্কুলের প্রেয়ার লাইনে হেডস্যর জানালেন, এই বছর সরকারি স্তরে একটা বিরাট বড় কম্পিটিশনের আয়োজন করা হয়েছে। ওদের স্কুল থেকেও স্পোর্টস আর কুইজ় বিভাগে নাম দেওয়া হয়েছে আর তার জন্য টিম বাছাই করা হবে। কিন্তু সেই কম্পিটিশন হবে মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে। এটা জানার পর থেকেই রাতুল আর স্কুলমুখো হয়নি। ও জানে কুইজ় আর রেসে ওর নাম থাকবে নির্ঘাত। কারণ ওকে বাদ দিয়ে টিম হতেই পারে না। কিন্তু বিদ্যাসুন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ের ড্রেস পরে মডেল ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ও ঢুকতে পারবে না। আর সেই জন্যই মায়ের কাছে মাথা ব্যথার নাম করে শেষ তিন দিন স্কুল কামাই করেছে ও। আর কিছু দিন কামাই করতে পারলেই...

"রাতুল, এক বার নীচে এসো।"

বাবা ডাকছে। বিছানা থেকে নেমে নীচে গেল রাতুল, আর গিয়েই চমকে উঠল। বসে আছেন হেডস্যর অবিনাশবাবু।

"স্যর, আপনি?"

"আমি বেশ কিছু ক্ষণ আগেই এসেছি। এত ক্ষণ তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলছিলাম। আর এ বার তুমি আর তোমার বাবা যদি কিছু মনে না করো, আমি তোমার সঙ্গে একটু একা কথা বলতে চাই।"

রাতুলের বাবা ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই হেডস্যর রাতুলের দিকে তাকালেন। আর তার পর বললেন, "আমি জানি রাতুল, আমাদের স্কুলটা এখনও তোমার খুব একটা পছন্দ নয়। অবশ্য এটা খুবই স্বাভাবিক, একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছেড়ে সরকারি বাংলা মিডিয়াম স্কুলে মানিয়ে নেওয়া খুব একটা সহজ নয়। আর যখন তোমার বাকি বন্ধুরা ওই স্কুলেই পড়ছে, তখন তোমাকে একা কেন ওই স্কুল ছাড়তে হল, এটা ভেবে নিশ্চয়ই রাগ হয়। কিন্তু আমি ভাবতাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তুমি হয়তো নিজেকে মানিয়ে নিয়েছ, কিন্তু গত তিন দিন তুমি..."

"স্যর, আমি আসলে..." কান্নায় ভেঙে পড়ে রাতুল।

"আমি বুঝতে পেরেছি ব্যাপারটা। তোমার আগের স্কুলে কম্পিটিশনটা হচ্ছে ভেবেই..."

"না, স্যর," কান্না থামিয়ে বলে রাতুল, "আমি কি ওদের সঙ্গে পারব? যদি হেরে যাই? আগে ওই স্কুলে যখন পড়তাম, তখন আমাদের স্কুলের ছেলেদের নিয়ে হাসাহাসি করতাম। আজকে ওরাও নিশ্চয়ই আমাকে নিয়েও তা-ই করে। ওদের সামনে আমি কী করে... আমাদের ক্লাসের আর কেউ নয়, এমনকি আমার জ্যাঠতুতো দাদাও নয়, শুধু আমাকেই ওই স্কুল ছেড়ে দিতে হয়েছে। আমিই কেন স্যর? শুধু আমিই কেন?"

"হুম্‌ম, এটা একটা বেশ বড় সমস্যা। শোনো তা হলে, তোমাকে আজ একটা গল্প বলি। এক বার এক ব্যক্তির একটা অপারেশন হয়, তা সেই অপারেশন চলাকালীন কোনও ভাবে তিনি এক মারাত্মক ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হন।

তাতে তাঁর এক মারাত্মক রোগও হয়।

"কিছু দিন পরে তাঁকে এক খবরের কাগজের সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আচ্ছা আপনার কখনও মনে হয়নি, ভগবানকে জিজ্ঞেস করতে যে, এই দুনিয়ায় এত লোকের মধ্যে আমিই কেন এই দুর্ভাগ্যের শিকার হলাম?'

"উত্তরে সেই ব্যক্তি প্রথমে হেসেছিলেন, আর তার পর হাসতে হাসতেই জানিয়েছিলেন, 'সারা পৃথিবীতে কয়েক কোটি লোক টেনিস খেলা পছন্দ করেন ও দেখেন। তাঁদের মধ্যে কয়েক লাখ লোক টেনিস খেলা শেখেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক হাজার পেশাদার খেলোয়াড় হন আর তাঁদের মধ্যে মাত্র কয়েক জন গ্র্যান্ড স্ল্যামে খেলার সুযোগ পান, আর তাঁদের মধ্যে মাত্র এক জন জেতেন। সেই সময় আমি যখন ভগবানকে জিজ্ঞেস করিনি এত জনের মধ্যে আমিই কেন, তা হলে এখন কেন করব?'

"সেই মহান টেনিস প্লেয়ারের নাম- আর্থার অ্যাশ, যাঁর নামের স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেন খেলা হয়। এ রকম আরও অনেকের কথাই আমি তোমাকে

“সেই মহান টেনিস প্লেয়ারের নাম- আর্থার অ্যাশ, যাঁর নামের স্টেডিয়ামে ইউএস ওপেন খেলা হয়। এ রকম আরও অনেকের কথাই আমি তোমাকে বলতে পারি, যারা নানা সময়ে নানা ভাবে নানা প্রতিকূলতা জয় করেছেন। আমি জীবনে কী করি সেটা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল আমি আমার কাজটা কী ভাবে করি। দিনের শেষে আমার কাজের ফলই আমার পরিচয়। একটা কথা মনে রেখো, খেলায় তারাই জেতে বা হারে, যারা খেলার মাঠে নামে। আর যারা সেই খেলা দেখে, তারা কিন্তু মাঠের সেই লড়াইটাকে মনে রাখে। এ বার তুমি ভাবো, তুমি কী করবে, খেলবে না হারার ভয়ে মাঠেই নামবে না?”

হেডস্যার চলে গেলেন। রাতুল বসে রইল চুপচাপ। তাঁর বলে যাওয়া প্রত্যেকটা কথা রাতুলের মনে ঝড় তুলেছে, আর সেই ঝড়ে ওর মনের মধ্যে জমে থাকা সমস্ত মেঘ আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। রাতুলের সামনে এখন খোলা আকাশ। ওর ইচ্ছে করছে সেই আকাশে দু'হাত মেলে উড়ে যেতে। না, আর ওর ভয় নেই। ভয় নেই পড়ে যাওয়ার, ভয় নেই হেরে যাওয়ার। রাতুল এগোবেই।

ছবি: বৈশালী সরকার

অক্টোপাসের দাঁত

পশুপতির মুখ থেকে ঘট করে একটা শব্দ ছিটকে বের হয়, “নীচের।” “কী স্যর!” “দাঁতের পাটি। নীচের।” বটুকদারোগা চুপ করে ছিলেন। এই বার উনিও কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। বহু দিন ধরেই যা নয়, তা-ই নিয়ে থানায় এসে ঝামেলা পাকাচ্ছেন এই পশুপতি। এই বার তাঁকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে।

বহু দিন পর কাল রাতে বেশ ভাল ঘুম হয়েছে। তাই সকাল থেকেই বটুক দারোগার মনটা বেশ ফুরফুরে। চায়ে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন, মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গাইছিলেন দু'-এক কলি, কিন্তু হঠাৎই ছন্দপতন। দরজায় পশুপতি গড়াই। লম্বুপানা ঘেটি থেকে বেগুনপানা মুখখানা উচ্চুঙ্গু করে দাঁড়িয়ে। যেন ডুবসাঁতারে এই ঘাটে এসে ভেসে উঠলেন ফস করে।

লোকটা যখন-তখন যে-কোনও কিছু নিয়ে থানায় চলে আসেন। ভাবখানা এমন, পুলিশ যেন পোষা পাখোয়াজ। যেমন খুশি বাজালেই হল। অন্য কেউ হলে অ্যাদ্দিনে চটকে চচ্চড়ি বানিয়ে দিতেন, কিন্তু পশুপতি এলাকার মান্যিগন্যিদের এক জন। কাজেই ঘেট্টিগোল্লা দেওয়ার সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। মৃদু হেসে পশুপতি বলেন, "হে হে সক্কালবেলাই বিরক্ত করলাম..."

"না না বিরক্তির কী আছে... হে হে... ঈশ্বরের দর্শন পাওয়া আর আপনার মতো মানুষের দেখা পাওয়া... দুটোই বড় কপাল করলে মেলে। আসুন।"

শকুনের চোখ পশুপতির। ভিতর পর্যন্ত দেখতে পান। বলেন, "এ আপনার রাগের কথা বটুকবাবু। কিন্তু কী করব, বাধ্য হয়ে আসতে হল।"

সামনের খালি চেয়ার দেখিয়ে দেন বটুকেশ্বর। বসতে বসতে পশুপতির পরের বাক্যি, "আসলে হয়েছে কী... পিতৃদেবের নীচের দাঁতের পাটিটা খুঁজে পাচ্ছি না।"

পশুপতির পিতা রমাপতি অমৃতধামে যাত্রা করেছেন সপ্তাহ দুই হল। বিছানায় পড়ে থাকেননি। ডাক আসার সঙ্গে সঙ্গেই চলে গিয়েছেন। দিন তিনেক আগেই ধুমধাম করে তাঁর কাজকম্ম হয়ে গেল। বটুকেশ্বরও ছিলেন নিমন্ত্রিত।

সে যাই হোক, দারোগা এখন পশুপতির কথা শুনে ভাবেন, এই লোকটার আরও কত বায়নাক্কা যে দিনে দিনে সহ্য করতে হবে! দু'-এক মুহূর্ত হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকার পর বলেন, "ছবির আর দাঁত দিয়ে কী হবে!"

"উঁহুহু... বিষয়টা লাইফ অ্যান্ড ডেথের নয় বটুকবাবু। কথাটা হল সেন্টিমেন্টের। যদি বাবা বেঁচে থাকতেন, তা হলে আমি এটা নিয়ে এতটা আবেগতাড়িত হতাম না। ভাবতাম যা গেছে, তা গেছে। আসলে উনি আর আমাদের মধ্যে নেই বলেই..." আবেগের বিড়ম্বনায় বার দুয়েক ফোঁৎ ফোঁৎ করেন, তার পর পাঞ্জাবির পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ দুটো মুছে নেন।

এই বকাসুর এসে সক্কালবেলা এমন তালগোল পাকিয়ে দিয়েছে যে, হাতে ধরা প্রজাপতিটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন বটুকেশ্বর মাইতি। চায়ের দফারফা হয়ে গিয়েছে এত ক্ষণে। বেজার মুখে বিস্কুটটা প্লেটে রেখে দিয়ে বলেন, "বুঝতেই পারছেন, আমাদের ফোর্স কম। সিরিয়াস বিষয়গুলোই..."

"কাল থেকে আমার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে চলেছে মি. মাইতি। আর আপনি বলছেন সিরিয়াস নয়! আমি মানছি... আমি মানছি ফোর্স কম, কিন্তু পুলিশের অসাধ্য কিছুই নেই।"

ভাঙা কাশির ঘ্যানর ঘ্যানর আর কাঁহাতক ভাল লাগে। তড়িঘড়ি দারোগা সাহেব বলে ওঠেন, "আমার একটা সম্ভাবনার কথা মাথায় আসছে পশুপতিবাবু।"

"দয়া করে বলুন মি. মাইতি।"

"আজ্ঞে ডেডবডির সঙ্গে... আসলে আপনার বাবা তো উইদাউট নোটিসে...আই মিন একেবারে হঠাৎ করেই চলে গেলেন। হয়তো দাঁত সমেতই গেছেন। বাঁধানো পাটি আর খোলার সময় পাননি।"

"ডোম!"

বিকট চিৎকারে একটা শব্দ বলে খানিক চুপ করে থেকে তার পর বাক্য শেষ করেন, "না স্যর, সে সুযোগ নেই। ডোম বলেছিল বাইরের কিছু নিয়ে বডি যাতে না ঢোকে। তাই আংটি, মাদুলি সব আমরা চেক করেই নিয়েছিলুম।"

"হ্যাঁ সে তো জানি। কিন্তু দাঁত!"

"সেটা আলাদা করে দেখার আর প্রয়োজনই হয়নি। হাঁ করা অবস্থাতেই তো বাবা চলে গেলেন। এমনিতেই সব কিছু দেখা যাচ্ছিল। উপরের পাটিটা অরিজিনাল ছিল, নীচেরটাই বাঁধানো হয়েছিল। কিন্তু ছিল না। তখন ভেবেছিলাম বাড়িতেই আছে। কিন্তু পরে আর খুঁজে পাইনি।"

"পেটে চলে যায়নি তো?"

"সে সম্ভাবনাও নেই। বাথরুমে স্ট্রোক হয়ে মারা গিয়েছেন। পোস্টমর্টেম হয়েছিল। সে রকম কিছু হলে রিপোর্টে কি আর থাকত না!"
"তবে তো ঠিকই আছে। পেটে কিংবা কেওড়াতলায় যদি মিসিং না হয়, তবে দাঁত ঠিক খুঁজে পাওয়া যাবে।"

কথোপকথনের মধ্যেই চায়ের দোকানি বিহারীলাল হাজির হয়। কাপগুলো নিতে এসেছে। দু'-একখানা বাক্য তার কানে গিয়েছিল। বলে, "স্যর, বেংকটাকালীর সেলুনে আমি কালকেই দেখেছি। চা দিতে গিয়েছিলুম। তখনই দেখলুম। দেখেই আমার মনে হয়েছিল দুম করে একখানা পাটি এইখানে গড়াগড়ি দিচ্ছে কেন!"
বটুক দারোগা দু'-এক মুহূর্ত হাঁ

করে থেকে বলেন, "কী! কী দেখেছিস! খুলে বল।"

"আজ্ঞে দাঁত। বড় আয়নার সামনে শোকেসের উপর রাখা। সাদা আলোয় ফকফকাচ্ছিল। এক বার খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন স্যর।"
বটুকেশ্বর এবং পশুপতি দু'জনের চোখই গোল হয়ে যায়। বিহারী চায়ের কাপ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলে পশুপতিকে জিজ্ঞেস করেন দারোগা, "আপনার বাবা কি সেলুনে যেতেন?"

"হ্যাঁ যেতেন তো। বেংকটাকালীর সেলুনেই যেতেন।"

এ তো খুব সহজ কথা নয়! যে নিখোঁজ হওয়া বস্তুটি নিয়ে তখন থেকে এতোল-

বেতোল চলছে, সেটা কিনা কালী বগলদাবা করে দিব্যি চুপ করে বসে আছে! তবে একখানা দাঁতের পাটি নিয়ে যে তার কী লাভ, সেটা ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না দারোগা।

(২)

থানার উল্টো দিকেই সেলুন। দারোগা সাহেবের নিয়মিত পদধূলি পড়ে ক্ষৌরকর্মের জন্য। চুল-দাড়ি সাফা হওয়ার পর মাথায় যখন তবলা বাজায় কালী, তখন আয়েসে চোখ বুজে আসে বটুকেশ্বরের। শিবনেত্র হয়ে সুখ-দুঃখের গল্প জোড়েন। মাঝে মাঝে কালীর কাছ থেকে হাতকাটা মনা, পাতলা হারাধন, ছ'নম্বর ঝঙ্কুর খবরাখবরও পান। যাই হোক, এখন কালবিলম্ব না করে তিনি বেংকটাকালীকে ডেকে পাঠালেন।

তলবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাজির হয় কালী। হঠাৎ করে পুলিশি তলবে সে বেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

দরজায় দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দেন বটুকেশ্বর, "উঁহু, ওইখানে নয়। ভিতরে আসতে হবে। ভিতরে," সক্কালবেলা দারোগা সাহেবের এই অভ্যর্থনায় আরও ব্যোমকে যায় বেচারা। গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে আসতে না-আসতে ধেয়ে আসে বটুকের প্রশ্নবাণ, "ওহে বেংকটা, তোমার ওখানে নাকি একটি বেওয়ারিশ দাঁতের পাটি পড়ে আছে?" কথা শুনে প্রথমটায় কিছুই ঠাহর করতে না পারলেও খানিক বাদে কালী বলে, "আজ্ঞে। কোনও কাস্টমার ফেলে গেছে। আপনি স্যর, কী করে জানলেন!"

"যা জানতে চাইছি তার উত্তর দাও। দাঁতের পাটি তোমার দোকানে কেউ ফেলে যাবে কেন?"
"আসলে স্যর, এক বার এক কাণ্ড হয়েছিল। এক জনের ছিল নকল দাঁত। দাড়ি কামাতে গিয়ে হল কী স্যর..."
"কী হল?"
"খুলে পেটে চলে যাওয়ার উপক্রম হল। কোনও রকমে সে যাত্রা অঘটনের হাত থেকে রেহাই পাই। তার পর থেকে সাবধান হয়ে গেছি স্যর। ফল্‌স হলেই খুলে রাখতে বলি।"

পশুপতি অনেক ক্ষণ চুপ করেছিলেন। এই বার হাউমাউ করে ওঠেন, "ওইটা আমার বাবার পাটি। এক্ষুনি ফেরত চাই।"

কালী এত ক্ষণে খানিক থিতু হয়েছে। সে পশুপতির ধমকে আর নতুন করে বিচলিত তো হয়ই না, বরং ঘেঁটি টেটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দারোগা বলেন, "কী হল কালী! দাঁড়িয়ে রইলে যে!"

"আজ্ঞে স্যর, উনি বললেই তো আর আমি দিয়ে দিতে পারি না।"

কালীর বাক্যি শুনে পশুপতির চোখজোড়া স্যাটেলাইটের মতো হয়ে যায়, "আমার বাপের জিনিস আমাকে ফেরত দিতে তোমার কী অসুবিধে হে!" কালীও ঠ্যাঁটা কম না। ঘাড় বাঁকা অবস্থাতেই বলে, "আজ্ঞে স্যর, প্রমাণ?"

"প্রমাণ! আমি কি মিথ্যে বলছি নাকি?"
"আজ্ঞে সত্যি-মিথ্যের ব্যাপার নয় স্যর। যদি ভুল হয়? আমার এখানে অনেকেই আসেন, নকলি নিয়ে। আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম, এ দিকে দেখা গেল ওই

পাটি অন্য কারও... তখন? জেনুইন লোক খুঁজতে এসে পেলেন না। তখন আমি ফেঁসে যাব দাদা।"

"জেনুইন? আমি জেনুইন নই অ্যাঁ!"
"আজ্ঞে স্যর, আপনি আমার ব্যাপারটা..."
কালীর কথা শেষ হওয়ার আগেই পশুপতির মুখ থেকে ঘট করে একটা শব্দ ছিটকে বের হয়, "নীচের।"
"কী স্যর!"
"দাঁতের পাটি। নীচের।"
বটুকদারোগা চুপ করে ছিলেন। এই বার উনিও কোমর বেঁধে নেমে পড়েন।

বহু দিন ধরেই যা নয়, তা-ই নিয়ে থানায় এসে ঝামেলা পাকাচ্ছেন এই পশুপতি। এই বার তাঁকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাওয়া গেছে।

দারোগা সাহেব বলেন, "পশুপতিবাবু, দাঁতের পাটি যে নীচের, সেটা আপনি আগেও বলেছেন। সে আর নতুন করে জানার কিছু নেই। এখন... ক'টা দাঁত আছে, সেটা যদি একটু বলেন তবেই বোঝা যাবে যে, ওই বস্তুটি রমাপতিবাবুর।"

এই বার রাগত পশুপতির মুখ দিয়ে ছিটকে বের হয় আর একটা শব্দ, "আটটায়ায়া..."

এত চটজলদি উত্তর কেউ আশা করেনি। বটুক দারোগা বলে ওঠেন, "আপনি নিশ্চয়ই বাঁধিয়ে এনে দিয়েছিলেন। তাই আপনার মনে আছে।"

"আজ্ঞে না। বাবা নিজের কাজ নিজেই করতেন। আসলে আমারও নীচের পাটির আটখানা দাঁত বাঁধানো।"

নিজের বাঁধানো দাঁতের সঙ্গে বাবার বাঁধানো দাঁতের সম্পর্ক উদ্ধার করতে পারেন না দারোগা সাহেব। এই দিকে বলে যান পশুপতি, "গৌরহরি গোস্বামীর নাম শুনেছেন?"

"কে গৌরহরি?"
"ডেন্টিস্ট। বাজারের মুখে চেম্বার..."
"হুম্ম শুনেছি।"
"ওঁর কথাটা আমার এখনও মনে আছে। অক্টোপাসের বংশধর। অক্টোপাসের বংশধর বলেছিলেন উনি আমাকে। ভাবতে পারেন! "
দারোগা বলেন, "ঠিক কী বলতে চাইছেন একটু যদি বুঝিয়ে বলেন... "

"বলছি। বাবার দাঁত বিগড়েছিল আশিতে, কিন্তু আমার এই বয়সেই নীচের পাটি মোটামুটি সাফ। ভাবলুম বাঁধিয়েই ফেলি। গোঁসাই ডাক্তারের কাছে যেতেই তিনি দেখেশুনে এক গাল হাসলেন। বললেন, 'বাব্বা এ তো দেখছি অক্টোপাসের বংশ!' কথা শুনে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলুম। তার পর নিজেই বললেন..."
"কী বললেন?"

"বাবা নাকি আগের মাসেই দাঁত বাঁধিয়েছেন। তা... তেনারও নাকি আমার মতো আটখানাই বাঁধাতে হয়েছিল। নীচের পাটির।"

এই বার দারোগার মনে হয় যে, যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এত

শুনেছেন?”

“কে গৌরহরি?”

“ডেন্টিস্ট। বাজারের মুখে চেম্বার...”

“হুম্‌ম শুনেছি।”

“ওঁর কথাটা আমার এখনও মনে আছে। অক্টোপাসের বংশধর। অক্টোপাসের বংশধর বলেছিলেন উনি আমাকে। ভাবতে পারেন! ”

দারোগা বলেন, “ঠিক কী বলতে চাইছেন একটু যদি বুঝিয়ে বলেন... ”

“বলছি। বাবার দাঁত বিগড়েছিল আশিতে, কিন্তু আমার এই বয়সেই নীচের পাটি মোটামুটি সাফ। ভাবলুম বাঁধিয়েই ফেলি। গোঁসাই ডাক্তারের কাছে যেতেই তিনি দেখেশুনে এক গাল হাসলেন। বললেন, ‘বাব্বা এ তো দেখছি অক্টোপাসের বংশ!’ কথা শুনে আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছিলুম। তার পর নিজেই বললেন...”

“কী বললেন?”

“বাবা নাকি আগের মাসেই দাঁত বাঁধিয়েছেন। তা... তেনারও নাকি আমার মতো আটখানাই বাঁধাতে হয়েছিল। নীচের পাটির।”

এই বার দারোগার মনে হয় যে, যথেষ্ট প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এত আত্মবিশ্বাস নিয়ে কেউ ভুল বলতে পারে না। দারোগা ইশারা করেন। বেংকটাকালী তিড়িং বিড়িং লাফ দিয়ে ছোটে রমাপতির দাঁতের পাটি আনতে।

ছবি: মহেশ্বর মণ্ডল

শার্দূলগড়ের রাজার মাসি

তার পর তো সে সব কথা রাজার কাছে খুলে বলল। বাঘরাজা সব শুনে খুশি হয়ে সবে একটা রাজকীয় গর্জন দিতে যাচ্ছিলেন, বানর মন্ত্রী হাতজোড় করে বলল, "দোহাই মহারাজ, দয়া করে হাঁকডাক করবেন না। বিলি আপনার মাসি হলেও ভলু, মহান সর্দার আপনার রাজকীয় গলার সঙ্গে পরিচিত নয়। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে নয়তো পালিয়ে যাবে। জঙ্গল অলিম্পিক্সে আপনার জঙ্গলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে ওদের কাজে লাগাতে হবে।"

বিলির আজ মন ভাল নেই। মন আর কী করে ভাল থাকবে, বন্ধুর শরীর খারাপ হলে কারও ভাল লাগে! এমনিতে বিলির বন্ধু ভলুর গায়ে খুব জোর, কিন্তু মাঝে মাঝে তার খুব জ্বর আসে, সে জ্বালাতনের এক শেষ, এই জ্বরের কোনও ওষুধ নেই, ভলু শুধু পড়ে পড়ে কাঁপতে থাকে। কিন্তু পড়ে থাকলে তো ভলুর চলবে না। মহান সর্দার সে কথা শুনবেই না, জ্বর নিয়েই কাজ করতে হবে। এই সময় মহান সর্দারের রোজগার বেড়ে হয়ে যায় দ্বিগুণ। ভলু যখন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে গড়াগড়ি খায়, তখন দর্শকরা খুব মজা পায়, জোরে জোরে হাততালি দেয়, আর পয়সা ছুড়ে দেয়। বিলির চোখ ফেটে জল আসে, কিন্তু সে কী করবে?

মকবুলের লাঠিকে যে তারা বড় ভয় করে। শুধু লাঠির বাড়ি হলে তবু একটা কথা ছিল, এক বার তো সর্দার উনুনের পোড়া কাঠ ভলুর নাকে চেপে ধরেছিল, সেই পোড়া দাগ এখনও ভলুর নাকের উপর ভূগোলের মানচিত্র হয়ে আছে।

বিলি যে ভলুকে নিয়ে অন্য জায়গায় পালিয়ে যাবে, তারও উপায় নেই। বিলি যে-কোনও জায়গায় নিজেকে মানিয়ে নিতে পারে, দরকার পড়লে কারও বাড়ির বারান্দায় বা হাটে-বাজারে শুয়ে পড়তে পারে। কিন্তু ভলুর সে উপায় নেই। তার বিরাট চেহারা দেখে অচেনা জায়গায় মানুষেরা ভয় পাবে, ইট-পাটকেল মেরেই হয়তো বেচারাকে মেরে ফেলবে, তারা তো জানে না, ভলুর চেহারাটাই বিশাল, মনটা শিশুর মতো সরল। বিলি আর ভলুর তিন কুলে কেউ নেই, সেই কোন ছোটবেলা থেকে তারা মহানের কাছে আছে, কী

ভাবে তারা মহানের খপ্পরে পড়েছে, বিলি আর ভলু তার কোনও খবর জানে না। পালিয়ে যাবেটা কোথায়? দু'জনেই যা দু'জনের ভরসা।

বিলি তাই ভলু যখন জ্বরে কাবু হয়ে পড়ে, তখন বেশি করে কসরত দেখায়। লাফায়, ঝাঁপায়, ডিগবাজি খায়। ভলুকে যাতে জ্বর নিয়ে বেশি পরিশ্রম না করতে হয়, সেই চেষ্টা করে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিলির খেলা কেউ দেখতে চায় না, তার লাফালাফি করাই সার, কেউ খেয়ালই করে না। সবাই ভলুর খেলা দেখতেই ব্যস্ত থাকে। তাই ভলুর কষ্টের শেষ নেই। সারা দিন মহান সর্দার এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে ঘুরে ঘুরে তাদের নিয়ে খেলা দেখায়, তবে দুটো পয়সা রোজগার হলে দিনের শেষে খাওয়া জোটে। রাতে তাঁবু ফেলে সেখানেই তাদের খাওয়া-শোয়া, সকালে উঠে আবার পথ চলা, অন্য কোনও লোকালয়ে গিয়ে আবার খেলা দেখানো। বিলির সন্দেহ হয় যে, মহানের তিন কুলেও কেউ নেই, অন্তত সে তো জ্ঞান হয়ে অবধি কাউকে দ্যাখেনি।

ওঃ হো, বিলি আর ভলুর পরিচয়টাই দেওয়া হয়নি। বিলি হচ্ছে সাদা-কালো একটা বিড়াল আর ভলু হচ্ছে কালো মিশমিশে একটা ভল্লুক। কোন ছোটবেলায় মহান ভলুকে অন্য এক ভল্লুকওয়ালার কাছ থেকে কিনে এনেছিল, বিলিকে রাস্তা থেকেই কুড়িয়ে পেয়েছিল। বিলির বেশি খাওয়াদাওয়ার ঝামেলা নেই, এঁটোকাঁটাতেই চলে যায় বলে মকবুল রেখে দিয়েছিল, নয়তো বোধ হয় দিত দূর করে।

এই ভাবে ঘুরতে ঘুরতে এক দিন বিলিরা গভীর জঙ্গলের ধারে একটা গ্রামে খেলা দেখাতে এসেছে, ওই গ্রামের মাত্র তিন মাইল পরেই বিখ্যাত শার্দূলগড় জঙ্গলের এলাকা শুরু হয়ে গেছে। সে দিন রাতে মকবুল সর্দার ঘুমিয়ে পড়ার পর, বিলি ভলুকে বলল, "বন্ধু, এই সুযোগ আর জীবনে পাব না। চলো আমরা জঙ্গলে পালাই, তা হলেই আমরা স্বাধীন, আর দিন রাত মার খেয়ে জ্বর-গায়ে তোমাকে খেটে মরতে হবে না।"

ভলু বলল, "কিন্তু জঙ্গলে যে যাবে, আমাদের কি জঙ্গলের আধার কার্ড আছে? জঙ্গলের রাজা আমাদের ঢুকতে দেবেন কেন?"

বিলি সে কথা শুনে এক চোট হেসে বলল, "ভলু ভাই, এটাও জানো না, জঙ্গলের রাজা বাঘ হল আমার বোনপো, আমি বিড়াল হলাম বাঘের মাসি। রাজার মাসি আর তার বন্ধুর জঙ্গলে কখনও আধার কার্ড লাগে?"

ভলু বলল, "তা-ই তো, বাঘ রাজা যে তোমার বোনপো, সেটা মোটে খেয়াল ছিল না। কিন্তু আমরা জঙ্গলে চলে গেলে মহান সর্দারের কী হবে ভেবে দেখেছ? আমরা খেলা দেখাই বলে, সর্দারের হাঁড়ি চড়ে। লোকটা মাঝে মাঝে একটু মাথা গরম করে বটে, তবে জ্ঞান হয়ে থেকে সর্দারের কাছেই আছি, কেমন মায়া পড়ে গেছে। আমরা দু'জনে ছাড়া তো সর্দারের তিন কুলে কেউ নেই।"

বিলি বলল, "কথাটা তুমি খারাপ বলোনি বন্ধু, তবে জ্বর গায়ে তোমাকে খেলা দেখাতে হলে, আমার ভারী কষ্ট হয়। ওই সময়টা তোমায় যদি সর্দার ছুটি দিত, তবে আমি পালানোর কথা মুখে আনতাম না।"

মহান সর্দার কিন্তু আসলে ঘুমোয়নি, মটকা মেরে বিলি আর ভলুর কথা শুনছিল। ওদের কথা শুনে মহানের চোখ জল চলে ভরে গেল। সে চুপি চুপি হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের জল মুছে উঠে বসে বিলি আর ভলুকে বলল, "আমি তোমাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছি, বিলিকে তো বেশির ভাগ দিন আলাদা করে খেতে দিইনি। এঁটোকাঁটা খেয়েই বিলি পেট ভরিয়েছে। তবে এঁটোকাঁটায় যে একটু বেশি মাছ, বেশি মুরগির ছাঁট, একটু বেশি ভাত মেখে দিয়েছি, সেটা বিলি কখনও খেয়াল করে দেখেনি। ভলুকে জ্বর গায়ে খেলা দেখাতে বাধ্য করেছি ঠিকই, তবে তোমরা বিশ্বাস করো, এ ছাড়া আমার কোনও উপায় ছিল না। ওই সময় ভলুকে ছুটি দিলে রোজগার হয়ে যাবে আধা, তাতে ভলুর যা খোরাকি সেটা জোগাড় করব কী করে? অসময়ের জন্য কিছু টাকা জমিয়েও রাখতে হয়। বর্ষার দিনগুলোয় খেলা দেখাতে বেরোতে পারি না, সেই সময় দরকারে নিজে না-খেয়ে তোমাদের দু'জনকে খাইয়েছি। তোমরা কি বলতে পারবে যে তোমরা কোনও দিন না খেয়ে থেকেছ?

"ভল্লুকের খেলা দেখানো আমাদের বংশের সাত পুরুষের পেশা, অন্য কাজ তো কোনও দিন করিনি। এমনিতেও শুনেছি সরকার বাহাদুর, ভল্লুক খেলা, বাঁদর খেলা দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। আমরা নেহাত শহর থেকে অনেক দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে থাকি বলে ভলু এখনও খেলা দেখাতে পারছে, তা হলেও আজকাল বড় ভয় হয়, কোন দিন সরকারিবাবুরা এসে না ভলুকে ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় ভরে দেয়। আমারও জেল হবে, তবে এক দিন ছাড়া পেয়ে যাব। আমার একটা পেট ঠিক কোনও না-কোনও কাজ করে চালিয়ে নেব।

"তোমাদের কথা শুনে আজ বুঝেছি, সরকার বাহাদুর ভল্লুক খেলা বন্ধ করে ঠিক কাজই করেছেন। বিড়াল পোষায় কিন্তু কোনও মানা নেই, সরকারিবাবুরা বিলিকে ধরবে না, ধরবে ভলুকে। ভলু কি চিড়িয়াখানায় বিলিকে ছেড়ে একা একা থাকতে পারবে?

"তার চেয়ে এই ভাল, তোমরা বিলির বোনপো শার্দূলরাজের রাজত্বে থেকে যাও। জঙ্গলে এখন বনের পশুপাখি মারার নিয়ম নেই। বিলি জঙ্গলে গেলে দু'দিনেই বনবিড়াল হয়ে যাবে। না হলেই বা কী, রাজার মাসিকে জঙ্গলে কে ঘাঁটাতে যাবে? ভলুও রাজসভায় মাঝে মাঝে খেলা দেখিয়ে রাজামশাইয়ের মন জয় করে ফেলবে।"

বিলি, ভলু মানুষের ভাষা না জানলেও, মহান সর্দারের কথা তারা অনেকটাই বোঝে। যেমন মহান তাদের ভাষা না জেনেও সব বুঝতে পারে। বহু বছর তারা এক সঙ্গে আছে তো। তাই বিলি আর ভলু মহান সর্দারের কাছ থেকে একটু সময় চেয়ে নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনায় বসল। ভলুর চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দি জীবন কাটানোর

কোনও ইচ্ছে নেই, তার থেকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে খেলা দেখানো আনন্দের কাজ, বিলিকে ছেড়ে থাকার তো প্রশ্নই নেই। বিলিও ভলুকে ছেড়ে থাকতে পারবে না, মুশকিল হচ্ছে সর্দারের সব কথা শোনার পর, তাকেও ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না।

ভলু তখন বিলিকে বলল, "বন্ধু, তোমার বোনপোকে বলে সর্দারকে জঙ্গলে একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে দাও। সর্দার অনেক রকম খেলা জানে, সে জঙ্গলে সব জন্তুর বাচ্চাকে জিমন্যাস্টিক্স শেখাতে পারবে। তা হলে সামনের জঙ্গল অলিম্পিক্সে শার্দূলগড় জঙ্গলের ঝুলিতে জিমন্যাস্টিক্সে সব বিভাগে সোনা বাঁধা। তাতে তোমার বোনপোর সম্মান কিন্তু অনেক বেড়ে যাবে।"

ও দিকে শার্দূলগড় রাজের গুপ্তচর খ্যাঁকশিয়াল জঙ্গলের ধারে অচেনা তাঁবু দেখে এসেছিল খোঁজখবর করতে। তার কানে বিলি আর ভলুর শলা-পরামর্শ যেতেই সে ছুটল প্রধানমন্ত্রী বানরের কাছে।

মন্ত্রীমশাই তো সব শুনে উল্লসিত। গত বার জঙ্গল অলিম্পিক্স জিমন্যাস্টিক্সে শার্দূলগড় একটাও পদক পায়নি। শার্দূলগড়ের জঙ্গলে এত ফলমূলের গাছ যে, এখানকার বাঁদরদের কোনও কসরত করতে হয় না, সব খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে, লাফালাফি করতেই চায় না।

এই বছরের জঙ্গল অলিম্পিক্সের মোটে পাঁচ মাস বাকি। শার্দূলগড়ের শার্দূলরাজ, প্রধানমন্ত্রীকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে, এ বারের জঙ্গল অলিম্পিক্সে শার্দূলগড় যদি সব থেকে বেশি পদক জেতে তো ভাল, নয়তো তোমার চাকরি নট হয়ে যাবে। প্রধানমন্ত্রী বানর আবার শার্দূলগড় জঙ্গলের ক্রীড়ামন্ত্রীও বটে, তাই বানর মন্ত্রী খুব ভালই জানে, শার্দূলগড়ের জঙ্গলকে যদি এ বারের অলিম্পিক্সে রণথম্ভোর, কানহা, বান্ধবগড়ের জঙ্গলকে পিছনে ফেলে পদক-তালিকার শীর্ষে উঠতে হয় তো জিমন্যাস্টিক্সে ভাল ফল করতেই হবে। নয়তো শুধু চাকরি নয়, তার গর্দানও যেতে পারে। বাঘ রাজার মেজাজ গরম হতে কত ক্ষণ?

ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড, সুইমিং, শটপুটে তার জঙ্গলের হরিণ, ভোঁদড়, হাতি, গন্ডাররা রীতিমতো দক্ষ, ওই সব ইভেন্ট থেকে পদক আসবেই। এখন মহান সর্দারের মতো ট্রেনারকে পেয়ে গেলে জিমন্যাস্টিক্সে কয়েকটা সোনার পদক একেবারে বাঁধা, ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে ভলুকে হারাবে কে? খালি কুস্তি শুরুর আগে, ভলুকে শিয়াল পণ্ডিত কবিরাজের এক পুরিয়া অ্যান্টি ভালুক-জ্বর নিমছাল চূর্ণ খাইয়ে দিলেই হবে। এই ওষুধটার কথা এখনও অন্য জঙ্গলের কবিরাজরা জানে না।

বিলি অবশ্য রাজার মাসি, সে কতটা দৌড়ঝাঁপ করতে রাজি হবে, তাতে সন্দেহ আছে। তা যাক গে, রাজপরিবারের আত্মীয়কে বেশি না ঘাঁটানোই ভাল। অলিম্পিক্সের জন্য মহান সর্দার আর ভলুকে পেলেই তার দিব্যি চলে যাবে।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না-করে বানর মন্ত্রী ছুটল, মহারাজ বাঘের দরবারে। সবে তখন পুবের আলো ফুটেছে, রাজামশাই নৈশভোজের শেষে পাথরের সিংহাসনে আধশোয়া হয়ে একটু আড়মোড়া ভাঙছিলেন।

মন্ত্রীমশাই সেখানে গিয়ে বাঘকে কুর্নিশ করে বলল, "মহারাজের বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য ক্ষমা চাইছি।"

তার পর তো সে সব কথা রাজার কাছে খুলে বলল। বাঘরাজা সব শুনে খুশি হয়ে সবে একটা রাজকীয় গর্জন দিতে যাচ্ছিলেন, বানর মন্ত্রী হাতজোড় করে বলল, "দোহাই মহারাজ, দয়া করে হাঁকডাক করবেন না। বিলি আপনার মাসি হলেও ভলু, মহান সর্দার, আপনার রাজকীয় গলার সঙ্গে পরিচিত নয়। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে

তার পর তো সে সব কথা রাজার কাছে খুলে বলল। বাঘরাজা সব শুনে খুশি হয়ে সবে একটা রাজকীয় গর্জন দিতে যাচ্ছিলেন, বানর মন্ত্রী হাতজোড় করে বলল, “দোহাই মহারাজ, দয়া করে হাঁকডাক করবেন না। বিলি আপনার মাসি হলেও ভলু, মহান সর্দার, আপনার রাজকীয় গলার সঙ্গে পরিচিত নয়। ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাবে নয়তো পালিয়ে যাবে। জঙ্গল অলিম্পিক্সে আপনার জঙ্গলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গেলে ওদের কাজে লাগাতে হবে। আপনি ওদের শার্দূলগড় জঙ্গলের নাগরিকত্ব, মানে অরণ্যত্ব প্রদান করুন।”

বাঘ রাজা তখন প্রসন্ন হয়ে সেই অনুমতি দিয়ে দিলেন।

সেই থেকে মহান সর্দার শার্দূলগড় জঙ্গলের অলিম্পিক্স টিমের প্রধান কোচ হয়ে সব সদস্যকে কঠিন অনুশীলনে ডুবিয়ে রেখেছে। ভলু কুস্তির আখড়ায় জান লড়িয়ে দিচ্ছে, সোনা জিতে তাকে রাজার মন জিততেই হবে, বিলি এখন তার বোনপোর রাজত্বে রাজার ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা, খেলাধুলো করার সময় তার নেই। তবে ভলু আর মহান সর্দারকে সে মোটেই ভোলেনি, অলিম্পিক্সে সোনা জিতলেই বোনপোকে ধরে ওদের ‘শার্দূলগড় রত্ন সম্মান’ দেবে বলে ঠিক করে রেখেছে।

আর তো কয়েক দিন বাদেই জঙ্গল অলিম্পিক্স শুরু, টিম শার্দূলগড়কে সমর্থন জানাতে জঙ্গল অলিম্পিক্সের টিকিট বুক করতে ভুল হলে কিন্তু মোটেই চলবে না।

ছবি: পিয়ালী বালা

ছবির ভূত অথবা ভূতের ছবি

দুপুরবেলা স্কুল থেকে ফিরেই কোনও রকমে পিঠ থেকে বইয়ের বোঝা নামিয়ে ড্রয়িং খাতা খুলে বসল পাল্কি। কালই স্কুলে আঁকা জমা দেওয়ার শেষ দিন। ক্লাসের সফ্‌ট বোর্ডের পুরনো মাসের ছবিগুলো খুলে এ মাসের নতুন ছবিগুলো টাঙানো হবে। তাই তড়িঘড়ি পাল্কির আঁকতে বসা। স্কুল ম্যাগাজিনে লেখা জমা দেওয়াই হোক বা আবৃত্তি প্রতিযোগিতার জন্য কবিতা মুখস্থ করা কিংবা অঙ্কের ইউনিট টেস্ট, সব ক্ষেত্রেই শেষ দিনের জন্য অপেক্ষা পাল্কির কাছে নতুন নয়। এ ক্ষেত্রেও তার কোনও ব্যতিক্রম হল না। মেয়ের আঁকার হঠাৎ এই অদম্য প্রয়াস দেখে মায়ের চোখে সর্ষে ফুল। রেগে মা খড়্গহস্ত হয়ে বললেন, "দুপুর রোদে তেতেপুড়ে এসেই অমনি আঁকা নিয়ে বসেছ? তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? নাওয়া-খাওয়ার নাম নেই?" বলেই তিনি ড্রয়িং শিটটা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন।

মায়ের কীর্তি দেখে হকচকিয়ে গেল পাল্কি। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মায়ের দিকে। রাগে গর গর করতে করতে মা গেলেন পাশের ঘরে। ছোট্ট মেয়ে পাল্কি। তার মাত্র ক্লাস টু। কী বোঝে সে খিদে-তেষ্টার, সময়-অসময়ের? তবে সে বিলক্ষণ বুঝতে পারল যে, মা ভীষণ রেগে গিয়েছেন। তার ফরসা ফোলা ফোলা গালে নিঃশব্দে দু'ফোঁটা চোখের জল ভিড় জমাল। সেটা অবশ্যই তার মায়ের বকার জন্য নয়। তার সাধের আঁকাটার খণ্ড খণ্ড চেহারা দেখে। মা পাল্কিকে প্রায় সব সময়ই চটাস চটাস দেন। আর বকা তো জলভাত। উঠতে বসতে বকা লেগেই থাকে। আবার পাল্কির মা পাশের ঘর থেকে এসে ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "তুমি এখনও ভ্যাবলার মতো হাঁ করে বসে আছ? ক'টা বাজে জানো? স্কুলড্রেসটা এখনও পর্যন্ত চেঞ্জ করতে পারলে না। স্নান-খাওয়া হতে হতে তো বিকেল হয়ে যাবে।"

আঁকার দিকে মন পড়ে থাকলেও মায়ের আদেশ শিরোধার্য করে পাল্কি দুপুরের স্নান-খাওয়া সেরে নিল। তার পর আবার বসে পড়ল ড্রয়িং খাতা নিয়ে। এই বার মা এসে সজোরে পিঠে এক ঘা বসিয়ে দিয়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে বিছানায় নিয়ে গিয়ে পিঠ চাপড়ে ঘুম পাড়াতে লাগলেন। কিন্তু কিছুতেই পাল্কির চোখে ঘুম এল না—'রুমকি, দিশা আবেশ সবাই আঁকা জমা দিয়ে দিয়েছে। আমাকে তো দিতেই হবে,' এই চিন্তা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। সে ঘাপটি মেরে ঘুমের ভান করে পড়ে থাকল। হঠাৎ শোনে মায়ের নাক ডাকার শব্দ। তড়াক করে বিছানা ছেড়ে সোজা পড়ার টেবিলে। কালবিলম্ব না করে বইপত্র সব সরিয়ে ড্রয়িং খাতা, পেনসিল আর ক্রেয়ন নিয়ে শুরু হয়ে যায় অপারেশন ড্রয়িং। কিন্তু কী আঁকবে সে? সকালে তো মা টিয়া পাখির ছবিটা নির্মম ভাবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। পাল্কি মনে মনে ভাবে আর সে টিয়াপাখির ছবি আঁকবে না। তার গোঁসা হয়েছে। ড্রয়িংয়ের বিভিন্ন বিষয় ভাবতে ভাবতে তার চোখ যায় ক্রেয়নের বাক্সটার দিকে। এই রং-পেনসিলের বাক্সটা তার ছোটমামা গত মাসে কিনে দিয়েছেন। হঠাৎ পাল্কির মাথায় একটা প্ল্যান খেলে যায়। সে ছোটমামার ছবি আঁকবে। যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। হাতের কাছে কোনও ছবি না পেয়ে, ছোটমামার মুখটা কল্পনা করে, অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে একটা অবয়ব দাঁড় করায়।

বিকেল হয়ে আসে। ছবিটা দেখতে দেখতে সে ভাবে, ছবিটা দেখে সবাই যদি হাসে, তা হলে কী হবে? তাই সে ঠিক করে, অফিস থেকে ফিরলে আগে সেই ছবিটা বাবাকে দেখাবে। বাবা তো আর হাসবে না। তার পর বাড়ির সবাইকে। জেঠু, কাকিমা ও বড়দি। সকলের শেষে মাকে। আঁকা শেষ হওয়ার খানিক ক্ষণ পর বিল্টু, টুকাই, সনু, তিতলি ও তিয়াশা খেলতে যাওয়ার জন্য পাল্কিকে ডাকতে আসে। বন্ধুদের গলার আওয়াজ পেয়েই ড্রয়িং খাতা, রং, পেনসিল সব তাড়াতাড়ি গুছিয়ে ফেলে পাল্কি, যাতে ওরা আঁকাটা দেখতে না পায়। ইতিমধ্যে পাল্কির মা উঠে পড়েছেন ঘুম থেকে। এক গ্লাস দুধ আর বিস্কুট খেয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যায় সে।

পাল্কিদের কমপ্লেক্সের মধ্যে একটা ছোট্ট খেলার জায়গা আছে। জায়গাটা বাঁধানো। অনেকটা উঠোনের মতো। সেখানেই ওরা খেলে। কোনও দিন ব্যাট-বল, কোনও দিন ব্যাডমিন্টন। আর বেশির ভাগ দিনই কানামাছি না হয় রুমালচোর। সে দিনও ওরা কানামাছি খেলছিল। পাল্কি চোখে রুমাল বেঁধে চোর হয়ে বন্ধুদের ধরতে চেষ্টা করছিল। যেই না সে টুকাইকে ছুঁয়ে ফেলেছে, অমনি চোখের রুমাল খুলে দ্যাখে অবাক কাণ্ড! বাবা এসে পড়েছেন। আজ এত তাড়াতাড়ি বাবা অফিস থেকে এসে যাওয়ায় পাল্কির আনন্দ আর ধরে না। সে ধেই ধেই করে নাচতে নাচতে বন্ধুদের টা টা করে বাবার হাত ধরে চলল তাদের ফ্ল্যাটের দিকে।

তিয়াশা বলল, "কী রে পাল্কি, আর খেলবি না?"

পাল্কি একগাল হেসে বলল, "না রে, আজ একটা ভীষণ ইম্পর্ট্যান্ট কাজ আছে।"

শুনে সবাই তো থ। ফ্ল্যাটের দিকে যেতে যেতে বাবাকে আঁকাটা সম্পর্কে প্রায় সব কথা বলা হয়ে গেল পাল্কির। কখন বাবাকে ছবিটা দেখাবে, শুধু তারই অপেক্ষা। ফ্ল্যাটে ঢুকেই বাবাকে হিড় হিড় করে টানতে টানতে সোজা নিয়ে হাজির হল পড়ার টেবিলে। কোনও রকমে জুতোটুকু খোলার সময় পেয়েছিলেন ভদ্রলোক। মেয়ের ড্রয়িং দেখে একগাল হেসে বললেন, "বাহ, বেশ হয়েছে। তা এটা কিসের ছবি মা?"

তত ক্ষণে ঘটনাস্থলে হাজির পাল্কির মা। মুখ গোমড়া করে মেয়ে বলল, "কেন, চিনতে পারছ না? এটা তো ছোটমামার ছবি।"

পাল্কির বাবার হাত থেকে ড্রয়িং শিটটা ছিনিয়ে নিয়ে পাল্কির মা ছবিটা দেখে তাচ্ছিল্যের ঢঙে হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "এটা ছোটমামার ছবি হয়েছে? এটা তো একটা ভূতের ছবি। ছিঃ ছিঃ, ছোটমামার ছবি আঁকতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা ভূতের ছবি একে ফেললি?"

এই জন্যই মাকে ছবিটা দেখাতে চায়নি পাল্কি। তার আঁকা ছবিটাকে ভূতের ছবি বলায় বেশ অপমান হল পাল্কির। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বাবাকে বলল, "ছবিটা তুমি ঠিক করে দেবে বাবা? কাল স্কুলে জমা দিতে হবে।"

বাবা মেয়েকে কোলে নিয়ে চোখের জল মুছে দিতে দিতে আদর করে বললেন, "তোমাদের আঁকার তো কোনও নির্দিষ্ট বিষয় নেই, তাই ভূতের ছবি আঁকলেই বা ক্ষতি কী?"

মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে বাবা বললেন, "তোমার কোনও চিন্তা নেই। আমি ছবিটায় না হয় একটু টাচ দিয়ে দেব।"

চা, জলখাবার খেয়ে বাপ-মেয়ে মিলে বসল ছবিটা মেরামত করতে। একটা বড় মাথা। তাতে ছোট ছোট কয়েকটা চুল। লিকলিকে হাত-পা। হাত-পায়ে আবার বড় বড় নখ। ছবিটা ভাল করে দেখে বাবা বললেন, "মন খারাপ কোরো না পাল্কি। তোমার মা ঠিকই বলেছেন। ছোট মামার ছবি আঁকতে গিয়ে তুমি সত্যি সত্যি একটা বাচ্চা ভূতের ছবি এঁকে ফেলেছ। এবং সেটা বেশ ভালই হয়েছে," বলে তিনি কয়েকটা বড় বড় দাঁত একে দিলেন। আর চোখ দুটো একটু বড় করে এঁকে তাতে লাল রং করে দিতেই সেই নিষ্প্রাণ ছবিটা সত্যি একটা ভূতের চেহারা নিল। দেখলে যেন ভয়ে গায়ে কাঁটা দেয়।

পর দিন স্কুলব্যাগে ছবিটা না ধরায় সেটা হাতে নিয়েই দিব্যি গুটি গুটি স্কুলে গেল পাল্কি। প্রথম পিরিয়ড শেষ হলে সবিতামাসি এসে ক্লাসের সফ্‌ট বোর্ডের গত মাসের সব পুরনো ছবি পাল্টে সে মাসের নতুন ছবিগুলো বোর্ডপিন দিয়ে আটকে দিয়ে গেল। পাল্কির আঁকা ভূতের ছবিটা বোর্ডের মাঝখানে একেবারে জ্বলজ্বল করছে। নিজের আঁকা ছবির ডিসপ্লে দেখে পাল্কি খুবই আনন্দিত। উত্তেজনার বশে ওয়াটার বট্‌ল স্কুলে

ফেলেই সে দিন বাড়ি ফিরল সে।

পর দিন স্কুলে গিয়েই দেখে হুলস্থুল কাণ্ড। গত কাল স্কুল ছুটির পর শান্তিমাসি পাল্কিদের ক্লাসরুম পরিষ্কার করতে গিয়ে নাকি ভূত দেখেছে। ভূতটা নাকি ক্লাসময় নেচে নেচে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ভয়ে শান্তিমাসি ক্লাস থেকে ছুটে বেরিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বড় আন্টিকে বলেছে, "আমি আর কোনও দিন ক্লাস টু-সি-র রুম পরিষ্কার করতে পারব না। ওই ক্লাসে ভূত আছে। একটা বাচ্চা ক্লাসে ওয়াটার বট্‌ল ফেলে গিয়েছে। আমি সেটা অফিসে জমা দেব বলে যে-ই না তুলেছি, অমনি আমাকে ঘিরে তার কী নাচ! নাকি গলায় আমাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'ওটায় হাত দেবে না একদম। হাত দিলে ঘাড় মটকে দেব।' বলেই আমার দরজা আটকে দাঁড়াল," বলতে বলতে হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করল শান্তিমাসি।

বড় আন্টি শান্তিমাসির কথা মোটেই বিশ্বাস করলেন না। সান্ত্বনা দিয়ে মাসিকে বললেন, "ও তোমার মনের ভুল। স্কুলে আবার ভূত আসবে কোথা থেকে? চলো তো গিয়ে দেখি।"

বড় আন্টি-সহ আরও চার-পাঁচ জন টিচার মিলে পাল্কিদের ক্লাসে চললেন ভূতের সন্ধানে। পিছন পিছন ভয়ে ভয়ে শান্তিমাসি। বড় আন্টি টু-সি-র ক্লাসরুমে ঢুকেই ওয়াটার বট্‌লটা তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কার?"

সামনেই হাজির ছিলেন ক্লাস টু-সি-র ক্লাস টিচার। তিনি বললেন, "এটা মনে হয় পাল্কির।"

পাল্কি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। হঠাৎ শান্তিমাসি পাল্কির আঁকা ভূতের ছবিটা বড় আন্টিকে দেখিয়ে বলল, "এই ভূতটাই এসেছিল। দেখুন, আমাকে কেমন দাঁত খিঁচোচ্ছে।"
বড় আন্টি বললেন, "এই ছবিটা কে এঁকেছে?"

ক্লাস টিচার বললেন, "এটা তো পাল্কির আঁকা। কী সুন্দর হয়েছে, না? সত্যি ভূতের মতো দেখতে!"

বড় আন্টি মাথা নেড়ে সায় দিলেন বটে কিন্তু তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল, ভূতের ছবি এবং ওয়াটার বট্‌ল দুটোই পাল্কির। মনে মনে তিনি একটা রহস্যের গন্ধ পেলেন।
ক্লাসে পর দিন থেকে ভূতের উপদ্রব বন্ধ হল। আস্তে আস্তে ছাত্র-ছাত্রী, টিচার, মাসি সকলের মন থেকে ভূতের ভয় ক্রমশ হারিয়ে গেল। ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে পাল্কি দেখে, তার আঁকা ছবির ভূতটা ওর দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসে। কেউ কাছাকাছি না থাকলে আবার হাতও নাড়ে! পাল্কি বেশ মজা পায়। একটুও ভয় পায় না। উপরন্তু ওর সঙ্গে বন্ধুর মতো আচরণ করে। ক্লাসের বন্ধুদের চোখে ধুলো দিয়ে দিব্যি দু'জনে সময় পেলেই খেলা করে। স্কুল ছুটির পর দু'জনে দু'জনকে টা টা করে বিদায় জানায়।

এই ভাবে দ্রুত কেটে গেল সেই মাসটা। পরের মাস পড়তেই আবার সবিতামাসি এসে পড়ল সফ্‌ট বোর্ডের ছবি পাল্টাতে। এক এক করে পুরনো ছবিগুলোকে খুলে ফেলে দরজার পাশে রাখা বিনে ফেলে দিচ্ছিল মাসি। অদ্ভুত ব্যাপার, পাল্কির আঁকা ভূতের ছবিটা বোর্ড থেকে খোলা মাত্র সবিতামাসির হাত ফস্কে উড়তে উড়তে এসে পড়ল পাল্কির স্কুলব্যাগের উপর। ঠিক সেই সময় বাংলা টিচার এসে পড়ায় বন্ধুরা সেটা খেয়াল করতে পারেনি। ছবিটা দেখে পাল্কির মনে হল, ভূতটা যেন তার সঙ্গেই যেতে চায়। চিন্তায় পড়ে গেল সে। বাড়িতে ভূতটা থাকবে কোথায়? মা-বাবা দেখে ফেললেই তো ঝামেলার একশেষ! এই এক মাসে পাল্কির বেশ খানিকটা মায়া জন্মেছে ভূতটার জন্য। তাই ভূতটাকে রাস্তায় একা একা ছেড়ে দিতে তার মন চায় না। সে চায়

ভূতটা তার সঙ্গেই থাকুক।

এই রকম নানান কথা ভাবতে ভাবতে কাঁধে স্কুলব্যাগ আর হাতে ভূতের ছবিটা নিয়ে স্কুলবাস থেকে নেমে পাল্কি চলল বাড়ির দিকে। বাসস্টপ থেকে পাল্কিদের ফ্ল্যাট বেশি দূরে নয়। তাই ফেরার সময় সে রোজ একাই যায়। সঙ্গে যে বন্ধুটি থাকে, সে সে দিন স্কুলে যায়নি। তাই সে একদম একা। রাস্তায় একটা বেলতলা পড়ে। বেলতলা পড়তেই ভূতটা ছবি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। ভূতের এমন কাণ্ড দেখে পাল্কি খানিকটা হকচকিয়ে গেল।

ভূতটা বলল, "জানি, আমাকে নিয়ে তুমি ভীষণ বিপদে পড়েছ। তোমাদের বাড়িতে গেলে সমস্যা আরও বাড়বে। তার চেয়ে তুমি আমাকে এই বেল গাছের মাথায় উঠিয়ে দাও। এখানে আমার বাবা-মা থাকে। আমি চিনতে পেরেছি।"

ভূতের মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে পাল্কি। ভূত আবার বলে, "যে দিন তুমি সেই এক মাস আগে ছবিটা হাতে নিয়ে এই বেলতলা দিয়ে স্কুলে যাচ্ছিলে, তার ঠিক কিছু ক্ষণ আগে আমি গাছ থেকে পড়ে গেছিলাম। যন্ত্রণায় আমার মাথা বন বন করে ঘুরছিল। কাউকেই আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছিল। হারিয়ে গেছিলাম আমি। ঠিক তখনই দেখি তুমি আসছ। হাতে একটা ভূতের ছবি। আমার ভীষণ চেনা ছবি। ছবিটা দেখে মনে হয়েছিল, এটা আমারই ছবি। তাই টুক করে ঢুকে পড়েছিলাম তোমার ছবিটার মধ্যে। তোমাকে আমার ভীষণ ভাল লেগেছে। এক মাস ধরে তোমাদের স্কুলে ক্লাস করে আমি অনেক কিছু শিখলাম, শুধু তোমার জন্য। তোমাদের স্কুল ক্যান্টিনের ভাল-মন্দ খাবার খেয়ে একটা মাস আমার ভালই কাটল। এখন আমার মা-বাবার জন্য বড্ড মন কেমন করছে। এক মাস মা-বাবাকে দেখিনি। ওরাও আমার জন্য খুব চিন্তা করছে নিশ্চয়ই। তুমি প্লিজ আমাকে এই বেল গাছের মাথায় তুলে দাও।"

বিবর্ণ মুখে পাল্কি বলল, "বুঝলাম, কিন্তু কেমন করে তোমাকে এত উঁচু বেল গাছের মাথায় তুলি, বলো! আমি কি আর বেল গাছের মাথায় উঠতে পারি?" কথাটা বলতে বলতে হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল পাল্কির মাথায়। স্কুল ব্যাগ নামিয়ে রেখে বেল গাছের নীচে বসে পড়ল সে। তার পর ভূতের ছবির পৃষ্ঠাটাকে ভাঁজ করে একটা সুন্দর এরোপ্লেন বানিয়ে ফেলল। প্লেন দেখে ছোট্ট ভূত তো আনন্দে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। তার পর পাল্কি সেটাকে উড়িয়ে দিল বেল গাছের দিকে। উড়তে উড়তে ছোট্ট প্লেন গিয়ে পড়ল বেল গাছের মগডালে।
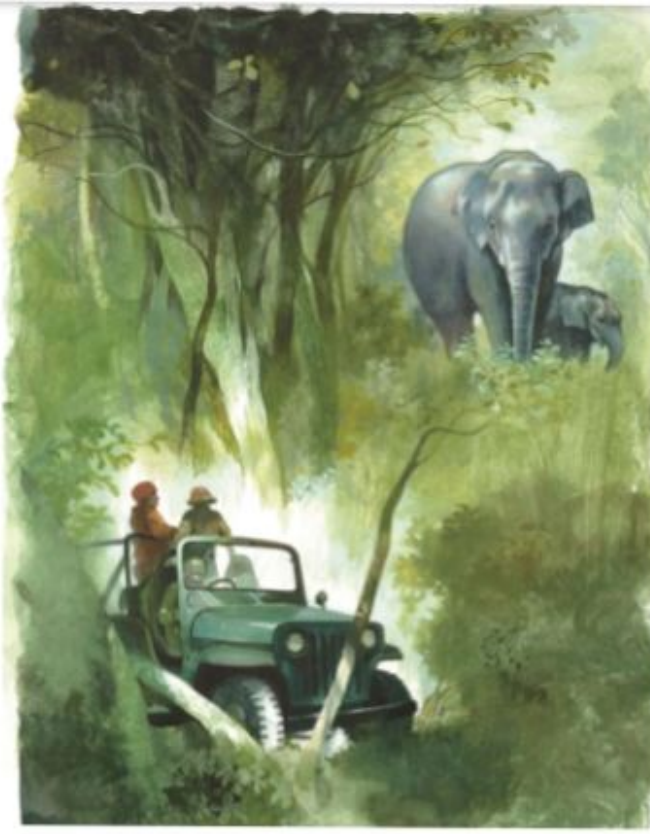
ছবি: প্রসেনজিৎ নাথ

ফুলমামার ফুলকিস্‌সা

ফুলমামা টেবিল থেকে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা জল খেয়ে বলল, “পর দিন সকালে অভিজ্ঞানকে রাতের ঘটনা বললাম। সে বিশ্বাস তো করলই না, উল্টে আমার মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিল। দুপুরের ট্রিপে জঙ্গল-সাফারির টিকিট কেটে রেখেছিলাম অনলাইনে।

গত কাল রাতে মায়ের মুখে ফুলমামার আসার খবরটা শোনার পর থেকেই যেন হাতে চাঁদ পেয়েছে পাপলু। শুক্রবার ইদ এসে পড়ায় পর পর তিন দিন স্কুল ছুটি। সুযোগ বুঝে পাপলু আর তার মা অনন্যা দু'জনে মিলে প্ল্যান ছকে ফেলেছে পলাশপুর যাওয়ার। সকালে বেরোনোর তোড়জোড় শুরু করতেই পাপলুর বাবা রঞ্জন উৎসুক গলায় জিজ্ঞেস করল, "এই অসময়ে হঠাৎ পলাশপুর যাওয়ার কারণটা কী, জানতে পারি?"

অনন্যা হাসিমুখে বলল, "কারণ হল ফুলদা। গত কাল রাতে এসেছে সে, পাক্কা এক বছর পর। ফুলদা এসেছে শুনে পাপলু খুব এক্সাইটেড। তাই ভাবলাম ওকে নিয়ে ঘুরে আসি দু'দিনের জন্যে। পরশু সকালেই ফিরে আসব।"

রঞ্জন খবরের কাগজ উল্টেপাল্টে দেখছিল। সেটা থেকে চোখ তুলে বিস্মিত গলায় বলল, "কে এসেছে বললে? তোমার সেই গুলদা!"

ফুলমামার ভাল নাম সৌম্যকান্তি সান্যাল। অনন্যার পিসতুতো দাদা। সরকারি চাকুরে। ভবঘুরে স্বভাব। ছুটিছাটা পেলেই বেরিয়ে পড়ে নতুন নতুন জায়গা দেখতে। পাপলুর কাছে তার ফুলমামা এক জলজ্যান্ত বিস্ময়। পাপলুর বয়সি ছেলেরা সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, হ্যারি পটার বা অরণ্যদেবের ভক্ত হয়, কিন্তু পাপলু তার ফুলমামার ভক্ত। পাঁচ ফিট দশ ইঞ্চি লম্বা ফুলমামার নির্মেদ শরীর, ছোট করে কাটা চুল, শ্যামলা গায়ের রং। ফুলমামার কাছে আছে একটা গল্পের ঝুলি। হরেক কিসিমের গল্প ভরা তাতে। ফুলমামা বলে কাহিনিগুলো সবই নাকি তার বাস্তব অভিজ্ঞতা। পাপলুরা হাঁ করে সেই সব কিস্‌সা শোনে এবং মনে মনে তারিফ করে ফুলমামার। যদিও পাপলুর বাবার মতো কেউ কেউ বলে ফুলমামার গল্পগুলো আদৌ সত্যি নয়, সবটাই তার মনগড়া, বানানো। আড়ালে তারা তাকে ফুলদা নয়, গুলদা বলে ডাকে।

পলাশপুরে পাপলুর আরও দু'জন সঙ্গী রয়েছে। ওম আর পুপে, তার মামাতো ভাই-বোন। পাপলুর মতো তারাও ফুলমামার ফ্যান। রাতের খাওয়া সেরে ফুলমামাকে ঘিরে গল্পের টানে বসেছে তিন জন। ফুলমামা বলল, "আজ একটা রহস্য গপ্পো শোনাব তোদের। মন শক্ত করে বোস।"

সকলে পিঠ টানটান করে বসল। ফুলমামা গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, "মাস তিনেক আগে হঠাৎই ভাবলাম অনেক কাল কোনও জঙ্গলে যাওয়া হয় না। হাতে কিছুটা সময় ছিল। তাই প্ল্যান করলাম ভুটান লাগোয়া, অসমের বিখ্যাত জঙ্গল মানস ন্যাশনাল পার্ক ভ্রমণের। গুগ্‌লে সার্চ করে জোগাড় করলাম একখানা রিসর্টের ফোন নম্বর। ঘরও বুক করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। তার পর নির্দিষ্ট দিনে ট্রেনে চেপে পৌঁছে গেলাম বরপেটা রোড স্টেশনে। সেখান থেকে গাড়ি ভাড়া করে সোজা চলে গেলাম মানস জাতীয় উদ্যান।"

পুপে জিজ্ঞেস করল, "তুমি একাই গেলে?"

"না রে, আমার সঙ্গে আর এক বন্ধু ছিল, অভিজ্ঞান। সে-ও আমার মতো উড়নচণ্ডী স্বভাবের। অভিজ্ঞান আর আমি মানস পৌঁছে একটা স্বস্তির শ্বাস নিলাম। এর আগে যখনই নির্জনতার খোঁজে কোনও জঙ্গলে বেড়াতে গিয়েছি, সেখানে শান্ত পরিবেশ তো পাই-ই-নি, উল্টে ঝালমুড়ি টুরিস্ট পার্টির অত্যাচারে কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড় হয়েছে। মানসে আমাদের রিসর্টটা ছিল নদী-লাগোয়া। ভারী সুন্দর। কয়েক মিটার পায়ে-হাঁটা পথ পেরোলেই এক পাশে চা বাগান আর এক পাশে ঘন সবুজ বন। গাছগাছালি ঘেরা অনেক ছোট ছোট কটেজ নিয়ে তৈরি রিসর্টটা। মাঝে চার পাশ খোলা কিচেন কাম ডাইনিং রুম। আকাশ মেঘলা থাকায় ঝুপ করে সাত-তাড়াতাড়ি সন্ধে নেমে এল। গোটা রিসর্টে আমরাই ছিলাম এক মাত্র বোর্ডার। চার দিকটা যেন

একটু বেশিই শান্ত। একটি মাত্র কম বয়সি ছেলেকে চোখে পড়ছে। তার মিশকালো গায়ের রং, মাথায় ঘন কালো চুল, চোখ দুটো লালচে। সে-ই রিসর্টের কেয়ারটেকার কাম রাঁধুনি। চুপচাপ আমাদের ডাইনিং রুমে খাবার সার্ভ করছে সে। ছেলেটি স্থানীয় আদিবাসী সম্প্রদায়ের, তাই বাংলা একেবারে বোঝে না। কোনও রকমে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কাজ চালায়। কথাবার্তা যতটা সম্ভব কম বলে।

"অভিজ্ঞান এক বার বলার চেষ্টা করল, 'ইতনা সন্নাটা কিঁউ হ্যায় ভাই? অর কোই নেহি হ্যায় ইঁহা?'

"ছেলেটা কী বুঝল জানি না, সে মাথা নেড়ে রান্নাঘরে ঢুকে গেল। রুটি আর ডিমের কারি অর্ডার দিয়েছিলাম। রান্না খুবই সুস্বাদু। চেটেপুটে খাওয়া শেষ করে যেই আমাদের কটেজে ঢুকতে যাব, অমনি লোডশেডিং হয়ে গেল। মেঘলা রাতের নিঝুম অন্ধকারে আবহসঙ্গীতের মতো কানে আসছে ঝিঁঝি পোকার ডাক আর শিয়াল-কুকুরের চিৎকার। আমি আর অভিজ্ঞান মোবাইলের টর্চ জ্বালিয়ে কোনও রকমে কটেজের সামনে পৌঁছোলাম।

"অভিজ্ঞান বলল, 'উফ! বড্ড অন্ধকার। মনে হয় জেনারেটর নেই এদের। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাটা সেফ নয়।'

"আমি একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বললাম, 'তুই এতটা ভিতু তো ছিলিস না। হঠাৎ কী হল আজ?'

"'না রে ভাই, শুনেছি এ সব জায়গায় অনেক ধরনের বিষাক্ত সাপখোপ থাকে। চটপট ঘরে চলে আয়।'

"'তুই যা, আমি আসছি একটু পরে।'

"অভিজ্ঞান ঘরে ঢুকে গেলেও আমি বাইরে দাঁড়িয়ে কালো রাতের শোভা দেখছিলাম। নদীর দিক থেকে ঠান্ডা হাওয়া এসে ঝাপটা মারছিল। কালোর ভিতরেও যে এত আলো থাকে, সে বিষয়ে একটুও ধারণা ছিল না আমার। অদ্ভুত শিহরন খেলে যাচ্ছিল সারা শরীরে। আচমকা বকুল ফুলের গন্ধ নাকে এসে লাগতেই আমার চটক ভাঙল। এমন মিষ্টি গন্ধ বহু কাল পাইনি। ভাবলাম, আশপাশে হয়তো কোথাও ফুলের গাছ আছে। রাতের অন্ধকারে গাছভর্তি বকুলফুল দেখার আশায় আমি কটেজের বারান্দা থেকে নেমে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। গন্ধটা কোন দিক থেকে আসছিল, ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। মোবাইল ফোনের টর্চ জ্বালিয়ে ইতিউতি দেখার চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও গাছ নজরে এল না। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল খুব কাছে কারও ভারী নিঃশ্বাস পড়ছে।চকিতে ফিরে তাকালাম আর সেই মুহূর্তে আমাকে চমকে দিয়ে অন্ধকার ফুঁড়ে বেরিয়ে এল একটা ছায়াশরীর। টর্চের আলোয় চোখে পড়ল সাদা শাড়ি পরা এক মহিলা। মাথায় এলোমেলো কাঁচা-পাকা চুল, গায়ের রং তামাটে। হাতে বেতের ঝুড়ি-ভর্তি বকুল ফুল। মহিলাটি ফ্যাকাসে দৃষ্টিতে কিছু ক্ষণ তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। আমি বললাম, 'এই রাতে এত ফুল কোথায় পেলেন?'

"মহিলাটি কোনও উত্তর দিল না। হয়তো আমার ভাষা বোঝেনি। ধীরে ধীরে সে হাঁটতে লাগল পিছন ফিরে। আমি আবারও কিছু বলতে গেলাম, কিন্তু মুখ থেকে কোনও কথা বের হওয়ার আগেই ইলেকট্রিসিটি চলে এল এবং আলো জ্বলে উঠল কটেজে। নিমেষে সে দিকে আমার নজর চলে গেল, কিন্তু মুখ ফিরিয়ে আর সেই মহিলাকে দেখতে পেলাম না! যেমন আচমকা এসেছিল, তেমনই অকস্মাৎ উধাও হয়ে গেল। কিছু ক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ঘরে ফিরে এলাম। ট্রেন জার্নির ক্লান্তিতে অভিজ্ঞান অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি দরজা বন্ধ করে চুপচাপ খাটের এক পাশে শুয়ে পড়লাম। যদিও সে রাতে চোখে ঘুম নামল না।"

এই পর্যন্ত বলে ফুলমামা থামল। ওম বলল, "ওই মহিলা কি ভূত ছিলেন? তবে যে হরর শোয়ে দেখেছি, ভূতেদের চেহারা ভয়ঙ্কর হয়! লাল টকটকে চোখ, জটাজূট চুল, কালচে জিভ..."

ওম কথা শেষ করার আগেই পাপলু অধৈর্য স্বরে বলে উঠল, "তুই থাম তো একটু। ফুলমামাকে বলতে দে বাকিটা।"

ফুলমামা টেবিল থেকে জলের বোতলটা তুলে নিয়ে বেশ খানিকটা জল খেয়ে বলল, "পর দিন সকালে অভিজ্ঞানকে রাতের ঘটনা বললাম। সে বিশ্বাস তো করলই না, উল্টে আমার মনের ভুল বলে উড়িয়ে দিল। দুপুরের ট্রিপে জঙ্গল-সাফারির টিকিট কেটে রেখেছিলাম অনলাইনে। তাই স্নান-খাওয়া সেরে তৈরি হয়ে নিলাম। যথাসময়ে উপস্থিত হল সাফারির জিপ। ভাগ্যক্রমে আমাদের গাইড ছিল বাঙালি। নাম সুশীল ঠাকুর। পরিষ্কার উচ্চারণে সে বাংলা বলে। জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হচ্ছিল। এক সময় সুশীল আমাদের অবাক করে জিজ্ঞেস করল, 'এই রিসর্টের ঠিকানা আপনাদের কে দিল?'

"জঙ্গলে প্রচুর হাতি, গন্ডার ইত্যাদি দেখে আমার মন তখন বেশ প্রফুল্ল। হাসিমুখে বললাম, 'অনলাইনে পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞেস করলে কেন?'

সুশীল গম্ভীর গলায় বলল, 'এই রিসর্ট সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত কথা বাজারে প্রচলিত আছে, তাই বললাম।'

"অভিজ্ঞান জিজ্ঞেস করল, 'অদ্ভুত কথা! সেটা কী রকম?'

"সুশীল স্টিয়ারিং ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'ওই রিসর্ট যেখানে হয়েছে সেই জায়গাটা ছিল ফুলমণি নামে এক বিধবা মহিলার। সেখানে তার শখের বাগান ছিল একটা। অনেক রকমের ফুল গাছ ছিল বাগানে। তার ছেলে শিবরাম গুয়াহাটির এক ব্যবসায়ীর কাছে জমিটা বিক্রি করবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু ফুলমণিবুড়ি রাজি ছিল না। মা আর ছেলের মধ্যে এই নিয়ে ঝামেলা লেগেই থাকত। এক দিন ফুলমণি মেয়ের বাড়ি যাবে বলে ঘর থেকে বেরোল, তার পর আর ফিরে এল না। কয়েক মাস পর শিবরাম জমিটা অনেক টাকায় বিক্রি করে এখান থেকে চলে গেল। লোকে বলে, শিবরামই তার মাকে খুন করে লাশ গুম করেছে।'

"সুশীল থামতেই সন্দিগ্ধ স্বরে জানতে চাইলাম, 'ঘটনাটা কত দিন আগের?'

"'তা বছর চারেক আগের হবে। রিসর্ট তৈরি হওয়ার পর সব কিছু ঠিকঠাকই ছিল। এমন ঝাঁ-চকচকে রিসর্ট এ তল্লাটে আর একটাও নেই। তাই টুরিস্টদের যাতায়াত লেগেই থাকত। গত বছর শীতের সময় প্রথম এক জন বোর্ডার রাতের অন্ধকারে ফুলের ঝুড়ি হাতে এক রহস্যময়ী মহিলাকে দেখতে পান। তার পর একে একে অনেকেই দেখেন। লোকে বলে ফুলমণির অতৃপ্ত আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায় ওই রিসর্ট চত্বরে। কারও কোনও ক্ষতি না হলেও রিসর্টের গায়ে ভূতুড়ে তকমা লেগে যায়। টুরিস্টের সংখ্যা কমতে থাকে দিন দিন। কোনও কর্মচারী থাকতে চায় না। ওই বুধুয়াই এক মাত্র রয়ে গেছে। ছেলেটা একটু গোঁয়ারগোবিন্দ, তবে রান্নার হাত চমৎকার। মালিক নিজে এখানে খুব কম আসে। বুধুয়াই দেখাশোনা করে রিসর্টের। আপনাদের মতো কোনও কিছু না জেনে মাঝে-মধ্যে দু'-একটা টুরিস্ট পার্টি এসে ওঠে ঠিকই, আবার ফিরেও যায় তাড়াতাড়ি। ব্যবসায় প্রচুর লোকসান হচ্ছে, তাই শুনছি মালিক নাকি রিসর্ট বন্ধ করে দেওয়ার প্ল্যান করছে। আপনারাও কি ভূতের দর্শন পেয়েছেন নাকি?'

"সুশীলের প্রশ্ন শুনে আমি আর অভিজ্ঞান মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। নিজেদের

সাহসী প্রমাণ করার জন্য তাচ্ছিল্যের স্বরে বললাম, 'ধুস! ভূত-টুতে আমরা বিশ্বাস করি না।'

"সুশীল মুচকি হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তবু রাতের বেলা সাবধানে থাকবেন।'

"রিসর্টের ভৌতিক ব্যাপারস্যাপার শুনে দু'জনেই খানিক চুপসে গিয়েছিলাম। ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামল সে রাতে। বুধুয়া খাবার ঘরে দিয়ে চলে গেল। দ্রুত খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল অভিজ্ঞান। লোডশেডিং হল আগের দিনের মতো একই সময়ে। গত রাতের স্মৃতি এখনও টাটকা। সেই রহস্যময়ী বৃদ্ধা আমাকে চুম্বকের মতো টানছে। কী এক ঘোরের মধ্যে চলতে চলতে বাইরে বেরিয়ে এলাম। বৃষ্টি কমেছে। মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে ক্ষয়াটে চাঁদ। আমি বারান্দায় এসে দাঁড়ানোর কিছু ক্ষণ পরেই ঠিক একই ভাবে বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসতে থাকল বকুল ফুলের গন্ধ।

"এ-দিক ও-দিক দেখতে দেখতে হঠাৎ কাছের জাম গাছের আড়ালে নজরে পড়ল একটা সাদা রঙের আবছা ছবি। চোয়াল শক্ত হল আমার। মনের সবটুকু জোর এক জায়গায় করে এগিয়ে গেলাম সে দিকে। মোবাইলে চার্জ ফুরিয়ে গিয়েছিল, তাই ওটা সঙ্গে আনিনি। ম্লান চাঁদের আলোয় দেখতে পাচ্ছিলাম সাদা শাড়ি জড়ানো মহিলাটিকে। সে ফুলের ঝুড়ি কাঁখে নিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছিল। আমি চুপিচুপি পিছু নিলাম। বোধ হয় সে আমার উপস্থিতি টের পেয়েছিল। তাই হাঁটার গতি বাড়াল। আমার কেমন মনে হল এই মহিলা কোনও অশরীরী নয়, রক্তমাংসের মানুষ।

"মহিলা দ্রুত পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেল পিছন দিকের অন্ধকার সুপুরি বাগানে। আমি কিছু ক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। অন্ধকারে চোখ সয়ে গিয়েছিল কিছুটা। তাই সাহস সঞ্চয় করে এক পা, দু' পা করে এগিয়ে যেতে থাকলাম বাগানের দিকে। একটা ঝোপের আড়াল লুকিয়ে দেখলাম সেই মহিলা বাগানের এক কোণে দাঁড়িয়ে সন্তর্পণে এ-দিক ও-দিক চাইছে। আশপাশে কেউ নেই বুঝতে পেরে সে পরনের সাদা শাড়ি আর পরচুলা খুলে ফেলল এক টানে এবং দেখতে দেখতে ফুলমণির প্রেতাত্মা পরিণত হল চুড়িদার-কুর্তিপরা এক মাঝবয়সি মহিলায়। পাছে পালিয়ে যায়, সেই আশঙ্কায় আমি দৌড়ে গিয়ে তার মুখোমুখি দাঁড়ালাম। মহিলাটি আমাকে দেখে আঁতকে উঠল। আমি কঠিন স্বরে জানতে চাইলাম, 'কে তুমি? কেন এ ভাবে ছদ্মবেশ ধরে মানুষকে ভয় দেখাচ্ছ?'

"ধরা পড়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সে ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, 'আপনি কে? পুলিশের লোক? নাকি মালিকের?'

"জোর গলায় বললাম, 'আমি যে-ই হই, নিজের ভাল চাও তো আমার প্রশ্নের উত্তর দাও।'

"মহিলাটি ঢোক গিলে বলল, 'আমি সরস্বতী, ফুলমণির মেয়ে।'

"ভ্রু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম, 'এখানে কী করছ?'

"সরস্বতী ঘাবড়ে গিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'আমার সঙ্গে মায়ের চেহারার অনেক মিল আছে। তাই সাদা শাড়ি, নকল চুল পরে ঘুরলে যে কেউ আমাকে মায়ের ভূত বলে ভুল করবে। দাদা বলেছে যদি আমি রিসর্টের বোর্ডারদের ভূত সেজে ভয় দেখাই, তা হলে আর কেউ এখানে আসবে না। মালিক ব্যবসা বন্ধ করে রিসর্ট ছেড়ে চলে যাবে আর আমরা আবার ফিরে পাব আমাদের জায়গা। এ বার জমির ভাগ হবে আধাআধি। অর্ধেক আমার, অর্ধেক ওর।"

"বললাম, 'তোমার মা কোথায়? সে বেঁচে আছে? আর দাদা? কোথায় থাকে সে এখন?'

“সরস্বতী ওড়না দিয়ে মুখ মুছে বলল, ‘মা বেঁচে নেই। আমার বাড়ি যাওয়ার সময় অ্যাক্সিডেন্টে মরে গেছে। জমি বিক্রির টাকা দিয়ে দাদা দুটো গাড়ি কিনে এখন বরপেটা শহরে ভাড়া খাটায়।’

“ফুলমণির ভূতের রহস্য সমাধান করার আশায় আমার মাথায় তখন ফেলুদার ভূত ভর করেছে। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এখানে এলে কী ভাবে?’

“সরস্বতী একটু চুপ করে থেকে তার পর বলল, ‘এই সব প্ল্যান দাদার। রাতের অন্ধকারে দাদা আমাকে এখানে নিয়ে আসে। রিসর্টের রান্নাঘরের পিছনে একটা গুদামঘর আছে। সেখানে সারা দিন লুকিয়ে থাকি আমরা। টাকা দিয়ে দাদা বুধুয়াকেও টেনে নিয়েছে নিজের দলে। কোনও বোর্ডার এলেই সে দাদাকে খবর দেয়। দাদার কথা মতো বুধুয়া রাতের বেলা সব লাইট অফ করে দেয় আর তখনই বেরিয়ে আসি আমি। বোর্ডাররা ভূতের ভয় পেয়ে চলে গেলে আমরাও ফিরে যাই।’

“গোটা বিষয়টা আমার কাছে এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কিন্তু ফুল নিয়ে কনফিউশনটা যাচ্ছিল না। বললাম, ‘ফুলগুলো কোথায় পেলে?’

“‘এই সুপুরি বাগানের শেষ প্রান্তে একটা বকুল গাছ আছে, মায়ের লাগানো। সেখানে সারা বছর ফুল ফোটে।’

“কথাগুলো বলে আচমকা আমার পা ধরে ফোঁপাতে লাগল সরস্বতী, ‘দয়া করে এই সব কথা কাউকে বলবেন না। দাদা আর বুধুয়া জানতে পারলে আমাকে মেরে ফেলবে।’

“আমি আর কথা না-বাড়িয়ে সরস্বতীর ফুলের ঝুড়ি থেকে এক মুঠো বকুল ফুল নিয়ে সুপুরি বাগান থেকে দ্রুত বেরিয়ে এলাম। ঘরে ফিরে অভিজ্ঞানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে ফুলগুলো ওর হাতে দিয়ে বললাম, ‘শোন, ফেরার টিকিটটা ক্যান্সেল করে দিচ্ছি। আরও দুটো দিন ভাবছি থেকে যাব এখানে।’

“অভিজ্ঞান এক বার ফুল, আর-এক বার আমার দিকে তাকিয়ে বিস্মিত স্বরে বলল, ‘এই ভূতের ডেরায় আরও দুটো দিন! তোর মাথা খারাপ নাকি পেট খারাপ?’

“আমি চোখ মটকে বললাম, ‘ভূত নয়, পেতনির ডেরা বল। তবে আমি জেনে নিয়েছি, ওটা নকল পেতনি।’”

এত ক্ষণ বিস্ফারিত চোখে ফুলমামার গপ্পো শুনছিল সকলে, কিস্সা শেষ হতেই একটা স্বস্তির শ্বাস ফেলল ওম, পাপলু, পুপেরা। হাসিমুখে পাপলু বলে উঠল, “ব্র্যাভো! ফুলমামা, তোমার জবাব নেই!”

মজার ঝাঁপি

রোনাল্ডিনহো ফুটবল অকাদেমি

গত মাসেই ফুটবল কিংবদন্তি রোনাল্ডিনহো কলকাতায় এসে কলকাতার রাজারহাটের মার্লিন রাইজ়-এর রোনাল্ডিনহো ফুটবল অকাদেমির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন। পৃথিবীর তেরোটি অকাদেমির মধ্যে এটিই ভারতের একমাত্র 'আর টেন' ফুটবল অকাদেমি। মার্লিন গ্রুপের পক্ষ থেকে সে দিন জঙ্গলমহল ও সুন্দরবনের প্রত্যন্ত অঞ্চলের চোদ্দো বছরের কমবয়সি দশ জন মহিলা ফুটবলারকে এক বছরের জন্য স্কলারশিপ দেওয়া হল। এই ফুটবল মাঠে রয়েছে অত্যাধুনিক অ্যাস্ট্রোটার্ফ, উন্নত ড্রেসিংরুম এবং প্রশিক্ষিত কোচ সহ বিশ্ব-স্তরের ফুটবল প্রশিক্ষণের জন্য অত্যাধুনিক পরিকাঠামো। এই মাঠটি এত বড় যে পাঁচ-এ সাইড এবং নয়-এ সাইডের দু'টি ম্যাচ এক সঙ্গে খেলা যায়। স্পোর্টস সিটির এই মাঠে খারাপ আবহাওয়ার সময় অনুশীলন করার জন্য রয়েছে উন্নত ইন্ডোর মাঠও। মার্লিন রাইজ়ের এই ফুটবল অকাদেমিতে পাঁচ থেকে সতেরো বছর বয়সি কিশোরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এটি কিন্তু ব্রাজ়িলের প্রধান আর টেন অকাদেমির গ্লোবাল হেড কোয়ার্টারের নির্ধারিত প্রশিক্ষণের মান অনুসরণ করে। এমনকি, ওখানকার আর টেন ফুটবল অকাদেমির প্রধান কোচ জেফারসন সপ্তাহে দু'বার অনলাইন মিটিংয়ের মাধ্যমে কোচদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও নির্দেশ দেন। ছাত্ররা চলতি বছরে আইএফএ নার্সারি ফুটবল লিগ (অনূর্ধ্ব বারো) এবং আইএফএ কলকাতা ফুটবল লিগে (অনূর্ধ্ব পনেরো এবং ষোলো) খেলেছে এবং সেখানে সফল ভাবে গোলও করেছে।

কৃত্রিম কয়লাখনির উদ্বোধন

ভারতে যে খনিজ পদার্থটি সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং আকরিক হিসেবে যেটি সবচেয়ে গুরুত্বের, সেটি হল কয়লা। ভারতে মূলত পূর্ব ও দক্ষিণ প্রান্তে ২৭টি কয়লাখনি আছে। বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজ়িয়াম দর্শনার্থীদের জন্য ৫৪০ বর্গকিলোমিটার জুড়ে একটি কৃত্রিম কয়লাখনি খুলে দিল, যেটি ভারতে এই প্রথম। কী ভাবে মাটির বহু নীচে গাঢ় অন্ধকারে বিপজ্জনক পরিবেশে কাজ হয়, খনিতে সুরক্ষা নেওয়া হয়, পুরনো ও নতুন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন এবং খনি-সংক্রান্ত সব কৌতূহলই মেটাবে এই ‘মক-আপ কোল-মাইন’ সফর। ১৮ অক্টোবর বহু বিশিষ্ট মানুষের উপস্থিতিতে এর উদ্বোধন হল। এ বার থেকে প্রতি দিন সকাল ৯:৩০-৬:০০ অবধি এটি টিকিট কেটে দেখা যাবে, এমনকি ছুটির দিনও। উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন স্কুলের ১২০ জন পড়ুয়া এই কয়লাখনি ঘুরে দেখল ও রোমাঞ্চিত হল।

পাঠ ভবন

আমার স্কুল

পড়ুয়াদের নিছক ‘ডিগ্রিধারী শিক্ষিত’ হিসেবে তৈরি করা নয়, বরং উন্নততর নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই এই স্কুলের আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্য।

পাঠ ভবন

ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঠ ভবন এক দল উচ্চমার্গীয় ও উদারমনস্ক শিক্ষকমণ্ডলীর উদ্যোগে পথ চলা শুরু করেছিল ১৯৬৫ সালে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষাদানের আদর্শ প্রথম থেকেই এই স্কুলের পাথেয়। এই কারণেই স্কুলের নাম রাখতে গিয়ে শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যায়তনের নামটিই নেওয়া হয়।

আজকের দিনে দাঁড়িয়ে, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ইংরেজি মাধ্যম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গে পাঠ ভবন এক অন্যতম উজ্জ্বল নাম। বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বর্তমানে ১৮০০-র বেশি। পঞ্চম শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক অবধি এই স্কুলে পড়ানো হয়।

ভারতী চট্টোপাধ্যায়

পাঠ ভবন এখন একটি অ্যাড হক বোর্ড (ডব্লিউবিবিএসই) দ্বারা পরিচালিত স্কুল, যার চেয়ারপার্সন ড. অনির্বাণ সরকার এবং সেক্রেটারি মুকুল গায়েন। বর্তমানে এই বিদ্যালয়ের টিচার-ইন-চার্জ ভারতী চট্টোপাধ্যায়। শিখন প্রক্রিয়া এই স্কুলে এক উপভোগ্য অভিজ্ঞতা। গোড়ার দিন থেকে এই স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের এমন ভাবে পড়ানো হয় যাতে তারা পরীক্ষার ভীতিতে জর্জরিত না হয়।

এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা যে স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গের দ্বারা, তাঁদের মধ্যে আছেন উমা সেহানবীশ, মঞ্জুশ্রী দাশগুপ্ত, নন্দিতা মিত্র, বীথিকা রায়চৌধুরী, ভামতী সেনগুপ্ত, নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, নিবেদিতা নাগ, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, লীনা দাশগুপ্ত, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায় এবং পারমিতা বিশ্বনাথন। এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হলেন সুশোভন সরকার, মীরা দত্তগুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায় এবং অবশ্যই সত্যজিৎ রায়। বিদ্যালয়ের প্রতীকটির নকশা করে দিয়েছিলেন তিনিই। তেমনই এই বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার প্রখ্যাত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মৈত্র। যিনি একই সঙ্গে কবি, সংগঠক এবং সঙ্গীত বিশারদ। ঋত্বিক ঘটকের বহু ছবিতে এবং সত্যজিৎ রায়ের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর নির্মিত তথ্যচিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন। সত্যজিৎ রায় ও মৃণাল সেন তাঁদের পুত্রদের শিক্ষার ভার এই বিদ্যালয়ের হাতে অর্পণ করেছিলেন। নাট্যকার শম্ভু মিত্রও পাঠ ভবনের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অভিনয় প্রদর্শন করেছিলেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বরুণ দে স্কুলের পরিচালন সমিতির সম্পাদক ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সন্তোষ ভট্টাচার্য বিভিন্ন সময়ে এই সমিতির

সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রখ্যাত সমাজকর্মী নিবেদিতা নাগ ও অ্যাডভোকেট জেনারেল অজিত দত্ত বিভিন্ন পর্বে বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। কবি শঙ্খ ঘোষের মতো কৃতী ব্যক্তিও সমিতির সম্পাদক ও সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন।

পড়ুয়ারা ব্যস্ত দেওয়াল-চিত্র আঁকতে

পাঠ ভবনের প্রাক্তনীদের মধ্যে বিশ্ববরেণ্য বহু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁরা স্ব স্ব ক্ষেত্রে বৃহত্তর সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। চলচ্চিত্র পরিচালক সন্দীপ রায়, অনীক দত্ত এই স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব হরি পিল্লাই, অনির্বাণ দত্তগুপ্ত এই স্কুলের ছাত্র। স্বনামধন্য শিল্পী চিত্রভানু মজুমদার, ইন্দ্রপ্রমিত রায়, ঈলিনা বণিক, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, গার্গী রায়চৌধুরী, সঙ্গীতশিল্পী অমিত কুমার (গঙ্গোপাধ্যায়), ইন্দ্রনীল সেন, শ্রাবণী সেন এবং অন্যান্য বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। বরেণ্য স্থপতি অঞ্জন উকিল, পুরাতত্ত্ববিদ অহনা ঘোষ, ইসরো-র বিজ্ঞানী শুভ্রদীপ ঘোষ, পদার্থবিদ উদ্দীপন বণিক এই স্কুলের কৃতী ছাত্র। সুবিখ্যাত সরোদবাদক সিরাজ আলি খান ও ইন্ডি ফোক ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সারণী পোদ্দার সাংস্কৃতিক জগতে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছেন।

এ ছাড়াও, এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী মৈত্রীশ ঘটক বর্তমানে লন্ডন স্কুল অফ ইকনমিক্সের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তবে বস্তুগত সম্পদ বা খ্যাতি অর্জন, কোনওটাই এই স্কুলের পড়ুয়াদের মূল লক্ষ্য নয়। পাঠ ভবন আসলে সমাজের অন্দরে লুকিয়ে থাকা গুপ্তধনের মতো প্রতিভার অনুসন্ধান করতে থাকে, যা প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর অন্তরে সুপ্ত থাকে এবং শেষ অবধি যে পেশার সঙ্গেই তারা যুক্ত হোক না কেন, তাদের নিজস্ব পৃথিবীতে সাফল্যের স্বাদ এনে দেয়।

বৃক্ষরোপণের দিন

ইঁদুরদৌড়ের প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী না হলেও এই স্কুলের শিক্ষাগত সাফল্যের খতিয়ান উল্লেখযোগ্য রকমের ভাল। পাঠ ভবনের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক, দুই পরীক্ষাতেই ধারাবাহিক ভাবে ভাল ফল করে। স্কুলের ছাত্রী অঙ্কিতা মণ্ডল ২০১২ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম ও মেয়েদের মধ্যে প্রথম স্থান পায়। ২০১৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সৃজা ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে তৃতীয় ও কলকাতায় প্রথম স্থান অধিকার করে। ২০১৪ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কুলদীপ গুহ মজুমদার রাজ্যে সপ্তম ও কলকাতায় দ্বিতীয় স্থান পায়। জয়েন্ট এগজ়ামিনেশন (মেডিক্যাল) পরীক্ষায় ভূপেন্দ্রনাথ সাহা রাজ্যে নবম স্থান পেয়েছে। ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় শ্রুতর্ষি ত্রিপাঠী মেধাতালিকায় স্থান পেয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকে ২০২২ সালে রোহিন সেন, রণদীপ ঠাকুর আর আদিত্য সাহা প্রথম দশে স্থান পেয়েছে।

স্কুলের লাইব্রেরি অত্যন্ত উচ্চ মানের, যেখানে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বই রয়েছে, যাদের অনেকে বিষয়ের দিক থেকে যেমন বহুমুখী, তেমনই দুষ্প্রাপ্যও। বিজ্ঞানের প্রতিটি বিষয়ের জন্য স্কুলে আলাদা আলাদা পরীক্ষাগার আছে। স্কুলের প্রেক্ষাগৃহটি বর্তমানে ঢেলে সাজানো হয়েছে। এ ছাড়া স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের শৈল্পিক বিকাশের জন্য রয়েছে আর্ট রুম। স্কুলের অঙ্কন ও সঙ্গীত বিভাগ যথেষ্ট শক্তিশালী। প্রতি বছর আর্ট গ্যালারিতে পড়ুয়াদের সৃজনশীল শিল্পকর্মের উৎসব হয়। সঙ্গীত আর পাঠ ভবন যেন সমার্থক শব্দ। স্কুলে আলাদা মিউজ়িক রুম আছে। রাজ্য স্তরের ও স্কুল আয়োজিত নানা উৎসবে ছাত্রছাত্রীরা অংশ নিয়ে এই স্কুলের নাম উজ্জ্বল করেছে।

বসন্ত উৎসবে ছাত্রীরা

লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কুলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন, বার্ষিক উৎসব, বসন্ত উৎসব, কারুকৃতি, ভাষা দিবস, বিজ্ঞান দিবস, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস আয়োজিত ও পালিত হয়ে থাকে।

স্কুলের নিজস্ব ম্যাগাজিনের নাম, 'লেখাজোকা'। পঞ্চম শ্রেণি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক অবধি প্রতিটি শ্রেণির বাচ্চাদের লেখা সৃজনশীল গল্প, কবিতা, আঁকা ছবিতে ভরে ওঠে এই ম্যাগাজিন।

স্কুলে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে খেলাধুলার বিষয়টি দেখা হয়। প্রতি বছর শীতকালে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হয়। মেয়ার্স কাপে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয়। স্কুলের পড়ুয়া কাজী জুনেইদ বাংলার রঞ্জি দলের অন্যতম সদস্য। অনুষ্কা দাস বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ নারী সুরক্ষা বিভাগের ক্যারাটে বিষয়ের ট্রেনার। সে জাতীয় স্তরের ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নও। পাঠ ভবনে প্রতি বছর ফুটবল ও ক্রিকেটের হাউস কাপ হয়। খুব সম্প্রতি ডিপিএস মেগা সিটি টুর্নামেন্ট ও এমপি বিড়লা আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্টে স্কুল রানার্স হয়েছে।

ছাত্রছাত্রীদের তথাকথিত 'ডিগ্রিধারী শিক্ষিত' হিসেবে গড়ে তোলা নয়, বরং উন্নততর নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল পাঠ ভবনের পূর্বতন শিক্ষকদের লক্ষ্য। তাঁদের সেই উদ্যমই বর্তমান শিক্ষকরা বহন করে চলেছেন।

.

নিজস্ব প্রতিনিধি